ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

ষষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

ষষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ সংকলন)

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ সহায়তায়
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ : মোঃ বরকত উল্লাহ বাবু, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরাতন) ২৭
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-0190-8

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ৯-৪৮
সরকারি খাতে দুর্নীতি

স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৯
তাসলিমা আক্তার

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস : প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায় ২৫
নিহার রঞ্জন রায়, নীনা শামসুন নাহার ও রুমানা শারমিন

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৩৩
মো. ওয়াহিদ আলম, নিহার রঞ্জন রায় ও নাজমুল হুদা মিনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫১-১০৮
বেসরকারি খাতে দুর্নীতি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৫১
*মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, নীনা শামসুন নাহার, মোহাম্মদ নূরে আলম,
মোরশেদা আকতার ও মো. রবিউল ইসলাম*

তৈরি পোশাক খাত : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় ৬৩
ড. সাদিদ আহমেদ নূরে মাওলা, ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী ও নাজমুল হুদা মিনা

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি ৭৬
ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী ও নাজমুল হুদা মিনা

**তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ :
এক বছরের (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা** ৯৫
নাজমুল হুদা মিনা ও মনজুর ই খোদা

**তৈরি পোশাক খাতে সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি
মোকাবিলায় অংশীজনের করণীয়** ১০২
নাজমুল হুদা মিনা, নীনা শামসুন নাহার ও শাহজাদা এম আকরাম

তৃতীয় অধ্যায় ১১১-১৩২
দুর্নীতি ও বিশেষ জনগোষ্ঠী

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি : বাংলাদেশের দুটি ইউনিয়নের চিত্র **১১১**
ফাতেমা আফরোজ, ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, শাম্মী লায়লা ইসলাম,
দিপু রায় ও শাহজাদা এম আকরাম

জাতীয় যুব সততা জরিপ ২০১৫ **১২৬**
মনজুর ই খোদা ও শাম্মী লায়লা ইসলাম

লেখক পরিচিতি **১৩৩**

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক পাঁচটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। বিষয় অনুসারে এ সংকলনটি তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সরকারি বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায় এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে পর্যালোচনা।

সংকলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে গবেষণার সারসংক্ষেপ।

সংকলনের তৃতীয় অধ্যায়ে দুর্নীতি ও বিশেষ জনগোষ্ঠী নিয়ে দুটি প্রতিবেদন রয়েছে। বাংলাদেশের দুটি ইউনিয়নের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার সারাংশ এবং জাতীয় যুব সততা জরিপ ২০১৫-এর সারসংক্ষেপ এ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

এ সংকলনটি প্রকাশ করতে টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীরা সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়েছেন। সংকলন গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। টিআইবির সব গবেষণার উপদেষ্টা হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিশেষ করে বোর্ডের সাবেক চেয়ারপারসন এম হাফিজউদ্দিন খান এবং বর্তমান চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের অমূল্য অবদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

সরকারি খাতে দুর্নীতি

স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

তাসলিমা আক্তার

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণার লক্ষ্য অর্জনে স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অনুসারে জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে এ খাতকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহারেও ধারাবাহিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ (অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য জনশক্তি, চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা ও চিকিৎসাসেবায় প্রযুক্তির প্রবর্তন প্রভৃতি) গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য খাতের কয়েকটি সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার পুরস্কারও অর্জন করে। যেমন– শিশুমৃত্যুর হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় (এমডিজি-৪) জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত, টিকাদানের মাধ্যমে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর কর্মসূচিতে অসামান্য সাফল্যে বাংলাদেশ *গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইম্যুনাইজেশন* (*গাভি*) পুরস্কার লাভ করে।

এ খাতে সাফল্য থাকা সত্ত্বেও রয়েছে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, যা স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত টিআইবির জরিপ প্রতিবেদন (বেজলাইন, রিপোর্ট কার্ড, জাতীয় খানা জরিপের অধীনে স্বাস্থ্যসেবার ওপর জরিপ, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের ওপর ডায়াগনস্টিক ও ফলো-আপ গবেষণা), বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ অনুযায়ী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার ৪০ দশমিক ২ শতাংশ সেবা গ্রহণে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং জাতীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন সেবা পেতে মোট ৭০ দশমিক ৩ কোটি টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া গণমাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে চিকিৎসকদের উপস্থিতি, সেবার মান, শয্যা, ওষুধ প্রাপ্তি, পথ্যের মান, বেসরকারি চিকিৎসায় অনিয়ম, দালালের উপস্থিতি, হাসপাতাল-সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে জানা যায়।

চিকিৎসাসেবায় সার্বিকভাবে সুশাসনের সমস্যা, বিশেষ করে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ, প্রভাব ও সেবার মান নিয়ে গবেষণার ঘাটতি। টিআইবির কার্যক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তিনটি খাতের একটি স্বাস্থ্য এবং এ খাতের ওপর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

---

* ২০১৪ সালের ৬ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য–

১. চিকিৎসাসেবা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. চিকিৎসাসেবায় বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা এবং এর কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

ওপরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবাদানকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (অবকাঠামো, বাজেট, জনবল), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম এবং বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা। গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার ধরনের মধ্যে রয়েছে– চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের কর্মী।

পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১২; যেখানে ৬৪টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী মোট খানা ছিল ৩ হাজার ২০৮ এবং ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তিনটি, জেলা সদর হাসপাতাল ২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুটি) ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ; যেখানে মোট উত্তরদাতা ছিলেন ১৪ হাজার ২৭৬। এ ছাড়া স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবির স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ সভা; যেখানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছিল, স্বাস্থ্য খাতসংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন, জাতীয় বাজেট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। তাদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়।

২ গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ চূড়ান্ত করে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব কর্মকৌশলের কিছু কিছু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন বা বিধিমালা তৈরির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যেমন– অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সবার জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও তা গ্রহণে উদ্যোগের অভাব রয়েছে, অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী বেসরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী সব স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্পর্কে বলা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি খুব সামান্য।

চিকিৎসকের অবহেলার কারণে কোনো রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি হলে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইনের যেমন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি কোড অব মেডিকেল এথিকসের ধারা ৫ (এ) অনুযায়ী অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কে নির্দেশনা থাকলেও এর বাস্তবায়ন খুবই সীমিত।

দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অর্ডিন্যান্স) ১৯৮২-আইনের ধারা ১১ (১)-এ নিবন্ধিত চিকিৎসকদের চেম্বার ও বেসরকারি ক্লিনিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না বা বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না– তা মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মকর্তার পরিদর্শনের কথা উল্লেখ থাকলেও পরিদর্শন কার্যক্রমের পর্যায়কাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ক্লিনিকগুলো নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন হয় না। ওই আইনের ধারা ৩, শিডিউল এ (২)-তে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে বলা হলেও কিছু কিছু পরীক্ষার মূল্য বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয়। যেমন– ইএসআর-৮ টাকা, হিমোগ্লোবিন-৮ টাকা, ব্লাড ক্রিয়েটিনিন-৩০ টাকা। এই আইনের কয়েকটি ধারায় পরবর্তীকালে সংশোধনী আনা হলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য-সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। এতে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ মর্জিমাফিক ফি নির্ধারণ করে রোগীর কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করছে এবং প্রতিষ্ঠানভেদে মূল্যের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওই আইনের ধারা ১৩ (২)-এ বেসরকারি ক্লিনিক আইনের কোনো ধারা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাবাস বা পাঁচ হাজার টাকা অথবা উভয়ই উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলেন, যেহেতু আইনটি অনেক পুরোনো, সেহেতু শাস্তির পরিমাণ কম হওয়ায় আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের প্রবণতা অব্যাহত থাকে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪-সংশোধনীর ধারা ৫-এর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্সে নিবন্ধিত মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের পরামর্শ ফি বাতিল করা হয়। ফলে পরামর্শ ফির কোনো ঊর্ধ্বসীমা না থাকায় চিকিৎসকভেদে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছাড়া উচ্চ ফি আদায়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংশোধনীর ধারা ৪-এর দ্বারা ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্সের ধারা ৭-এ বেসরকারি চিকিৎসায় পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা ক্লিনিকগুলোতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতার (ডিম্যান্ডেড আন্ডার দিস অর্ডিনেন্স) বিষয়টি শিথিল (ডিম্যান্ডেড বাই হিম অর ইট) করা হয়। এতে পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের আগে থেকে জানার সুযোগ থাকে না।

গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২– এই অধ্যাদেশের ধারা ৪, ৫, ও ৬-এ বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির জন্য দণ্ড, অফিস ত্যাগের জন্য দণ্ড এবং বিলম্বে উপস্থিতির জন্য দণ্ড রয়েছে। বাস্তবে এসব ধারার প্রয়োগ সীমিত।

২.২ আর্থিক সীমাবদ্ধতা

জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের হার : কয়েক বছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, শতকরা হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের হার ক্রমান্বয়ে কমছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যা ছিল ৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির সাপেক্ষে বরাদ্দ : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য খাতে কমপক্ষে যেখানে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির সাপেক্ষে বরাদ্দ ১ শতাংশ বা তারও কম। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই হার ছিল ১ শতাংশ , ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্যসেবায় খরচ : সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবায় জনপ্রতি বরাদ্দ বছরে ৩৯০ টাকা, যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে ২ হাজার ৬৫২ টাকা হওয়া উচিত।

উন্নয়ন ব্যয়ের হার : স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দে উন্নয়ন ব্যয়ের হার ক্রমান্বয়ে কমছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশে।

কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান : স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের তিনটি কর্মসূচিতে (১৯৯৮-২০০৩, ২০০৩-২০১১, ২০১১-২০১৬) বরাদ্দ তহবিলের বিপরীতে সরকারের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। ওই সময়ে সরকারের অবদান ৬২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ৩৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ২৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা : সদর হাসপাতালের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তার ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই। হাসপাতালের চিকিৎসাসামগ্রী জরুরি প্রয়োজনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামো সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ খরচ করার ক্ষমতা সিভিল সার্জনেরও নেই। তা ছাড়া হাসপাতালের লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি মেরামতের ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পরিচালনায় অর্থ : স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা রয়েছে; যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অ্যাম্বুলেন্স, জেনারেটর, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে।

২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

২.৩.১ *প্রয়োজনের তুলনায় মানবসম্পদের স্বল্পতা*

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট অনুমোদিত জনবলের (১,১৫,৯৩৫) বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে ২২ হাজার ৬১৮ (২০ শতাংশ)। অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি পদ শূন্য রয়েছে নন-চিকিৎসক মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের, যা ৫৬ শতাংশ (২৭৪ জন)। এর পরই রয়েছে প্রথম শ্রেণির চিকিৎসক মর্যাদায়, যা ২৮ শতাংশ (৬১৯৮ জন)। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং মাঠপর্যায়ে ডমিসিলিয়ারি স্টাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অনুমোদিত পদের (৬৪২৮) বিপরীতে শূন্য পদ ২১ শতাংশ (১৩৩২) এবং ডমিসিলিয়ারি স্টাফদের অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ ৮ দশমিক ৯ শতাংশ (২৩৫০)। বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের যেমন শূন্যতা রয়েছে, তেমনি বিদ্যমান জনবলের অনুপাত বিশ্ব মানদণ্ড অনুপাতে নয়। যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে চিকিৎসক ও নার্সের স্বীকৃত অনুপাত ১:৩, বাংলাদেশে এ অনুপাত ১:০.৪। বাংলাদেশে নার্স ও শয্যাসংখ্যার অনুপাত ১:১৩; যা স্বীকৃত অনুপাত প্রতি শিফটে সাধারণ শয্যায় ১:৪ ও স্পেশালাইজড শয্যায় ১:১। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রতি ৩ হাজার ২৯৭ জনের জন্য একজন চিকিৎসক (আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত ১:৬০০), প্রতি ১১ হাজার ৬৯৬ জনের জন্য একজন নার্স এবং প্রতি ২৭ হাজার ৮৪২ জনের জন্য রয়েছে একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট।

২.৩.২ *জনবল পদায়ন-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা*

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল পদায়ন দেওয়া হলেও কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদগুলোতে পদায়ন দেওয়া হয়নি বলে গবেষণায় দেখা যায়। যেমন– এ শ্রেণির ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৬টি জেলায় ডেপুটি সিভিল সার্জন পদ তৈরি করা হলেও ছয়টি জেলায় ওই পদে পদায়ন নেই, জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি করা হলেও চারটি প্রতিষ্ঠানে ওই পদে পদায়ন নেই এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৩টি ইউএইচএফপিও পদের মধ্যে ১১টি উপজেলায় ওই পদে পদায়ন দেওয়া হয়নি।

২.৩.৩ *মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘসূত্রতা*

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে, সিলেকশন গ্রেড দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং চলতি দায়িত্ব পদটি নিয়মিতকরণে বিলম্ব হয়। প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান, তেমনি প্রশাসনিক এবং শিক্ষকতা মর্যাদায় চলতি দায়িত্ব পদটি নিয়মিতকরণেও বিলম্ব হয়। চলতি দায়িত্ব পদটি ছয় মাসের মধ্যে নিয়মিতকরণ করা হবে বলা হলেও এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা হয় না। আবার চলতি দায়িত্ব হিসেবে যে অভিজ্ঞতায় বেশি তাকে দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে জুনিয়রকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল শূন্যতার পেছনে রয়েছে নিয়োগ প্রদানে দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যেমন– স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবলের অনুমোদন পেতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় (স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে) অনুমোদন পেতে যেমন অনেক বেশি সময় লাগে, আবার কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া যায় না। এ ছাড়া নিয়োগে দলীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনে রিট হলে শূন্য পদগুলো পূরণে বিলম্ব হয়। অধিকন্তু অবসর, মৃত্যু, চাকরি ছেড়ে দেওয়া এবং নতুন পদ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পদের শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

চাহিদা সাপেক্ষে হাসপাতালগুলোতে রোগী ও শয্যা অনুপাতে চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য পদে জনবলের যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি নতুনভাবে জনবল নিয়োগের বিষয়টি যাচাই না করে নতুন বিভাগ খোলা এবং শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের সব সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপনের দায়িত্বে রয়েছে নিমিউ। এসব যন্ত্রপাতি মেরামতে নিমিউতে যেমন জনবলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তেমনি দক্ষ জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে।

২.৩.৪ *প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা*

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি : দেশে রাষ্ট্রীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয়ে কতজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন এটি মূল্যায়ন করা হয়নি। তা ছাড়া চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। বিসিপিএস ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে অবসটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজিতে ৩৪৯ জন চিকিৎসকের জন্য সিট থাকলেও অ্যানেসথেসিওলজিতে এই সংখ্যা ৪৫ জন। চিকিৎসাসেবায় অ্যানেসথেটিস্ট-সংকটের কারণে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অপেক্ষা করতে হয়।

উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণে থাকাকালীন বেসরকারি চিকিৎসাচর্চা : উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য চাকরি থেকে প্রেষণে থাকার সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হলেও এর ব্যত্যয় ঘটে।

উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহারে দুর্বলতা : একজন চিকিৎসক জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারি) হওয়ার পর পদায়ন দেওয়া হয় উপজেলায়। কিন্তু উপযুক্ত লজিস্টিক ও

সহায়ক জনবল না থাকার কারণে (যেমন–অ্যানেসথেটিস্ট না থাকা, ওটিতে যন্ত্রপাতি পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন জনবল না থাকা ইত্যাদি) উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণটি কাজে লাগানোর সুযোগ কম।

প্রশিক্ষণের অনুমতির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা : কোনো চিকিৎসক কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অংশগ্রহণে অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ে তিনি ছুটি পান না। যখন ছুটির অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ওই প্রশিক্ষণের সময় শেষ হয়ে যায় এবং চিকিৎসক ওই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

২.৩.৫ *তদারকি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা*

উচ্চশিক্ষায় তদারকির ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা : উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের তদারকির ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। একজন প্রশিক্ষণার্থী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছেন কি না, প্রতিদিন কী কাজ করছেন, ওটিতে কতগুলো দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করছেন, সেগুলোর যথাযথ তদারকিতে শিক্ষকদের দিক থেকে যেমন ঘাটতি রয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন কি না, সে বিষয়গুলোও যথাযথভাবে তদারক করার জন্য কর্তৃপক্ষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে না।

উপস্থিতি কার্যক্রমে তদারকির ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা : চিকিৎসকদের যথাসময়ে হাসপাতালে উপস্থিত না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হাসপাতাল ত্যাগ করলে তার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অন্যদিকে, কর্মচারীদের উপস্থিতি ও কাজের ক্ষেত্রেও যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তদারকির ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা : বেসরকারি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানগুলো অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলি পূরণ করে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ও যথাযথ তদারকি ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রায় আট হাজারের অধিক প্রতিষ্ঠান তদারকির দায়িত্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা জনবলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

২.৩.৬ *অবকাঠামো ও লজিস্টিকস*

হাসপাতালগুলোতে চাহিদার তুলনায় শয্যার স্বল্পতা রয়েছে। যে কারণে রোগীরা অনেক ক্ষেত্রে ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পান না। জানা যায়, প্রতি ১ হাজার ৬৯৯ জনের জন্য শয্যা রয়েছে একটি। চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন-সুবিধা নেই; যেগুলো আছে, এর অধিকাংশই বসবাসের উপযোগী নয়। উপজেলা পর্যায়ে এই সমস্যা প্রকট। উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসকদের বসার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থাপনা (চেয়ার, টেবিল, কক্ষ ও টয়লেট ইত্যাদি) নেই। নার্স ও কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন-ব্যবস্থা নেই, জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসকদের যানবাহনের সুবিধা নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার এবং নারী রোগীর জন্য বহির্বিভাগে পৃথক বসার ব্যবস্থা নেই। জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ, আইসিইউ, সিটি স্ক্যান যন্ত্র এবং লিফট নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে এ সমস্যাটি প্রকট। জেনারেটর থাকলেও তা চালানোর জন্য জ্বালানির পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই।

২.৩.৭ *ওষুধ ও চিকিৎসার উপকরণ*

হাসপাতালে মজুত ওষুধের তালিকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন টাঙানো হয় না, তেমনি নিয়মিত তা হালনাগাদও করা হয় না। অধিকাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্স-রে যন্ত্র সচল থাকে না। এ ছাড়া আলট্রাসনোগ্রাম, এক্স-রে ফিল্ম ও ইসিজি যন্ত্রের অভাব রয়েছে। জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সরঞ্জামের অভাব রয়েছে; বিশেষ করে ডিজিটাল এক্স-রে, ইকো-কার্ডিয়াক, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি।

২.৩.৮ *অ্যাম্বুলেন্স-সুবিধা*

হাসপাতালগুলোতে যেমন অ্যাম্বুলেন্সের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তেমনি অনুমোদিত অ্যাম্বুলেন্সের সবগুলো সচল নয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি সচল অ্যাম্বুলেন্স এবং জেলা সদর হাসপাতালে দুটি সচল অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে অ্যাম্বুলেন্সের অপর্যাপ্ততায় রোগীদের একটি অংশ বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর বেশির ভাগের মালিকানা হাসপাতালে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর। তারা তাদের বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নেওয়ার জন্য রোগীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত আদায় করে থাকেন।

২.৩.৯ *স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসার পরিবেশ*

ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে হাসপাতালে উপস্থিতি : ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতালের অভ্যন্তরে চিকিৎসকের কক্ষে প্রবেশে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দিন ও সময় বেঁধে দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। এতে চিকিৎসকের দিক থেকেও প্রশ্রয় রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম মাঝেমধ্যে বাধাগ্রস্ত হয় : হাসপাতালের অভ্যন্তরে রোগীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তার আত্মীয়স্বজন ও হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা, স্থানীয় প্রভাবশালীর সাথে চিকিৎসকদের বিভিন্ন বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রভাবশালী কর্তৃক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের ওপর হামলা, শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের সাথে রোগীকে কেন্দ্র করে এবং সেবা-সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংগ্রহে গণমাধ্যমের কর্মীদের সাথে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের সংঘর্ষের ঘটনায় হাসপাতালে মাঝেমধ্যে রোগীর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

হাসপাতালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রভাব : হাসপাতালগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে মারামারি করে আসা রোগীরা কেস করার জন্য তাদের পক্ষে মেডিকেল সার্টিফিকেট পেতে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা বা তাদের প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন অনৈতিক হস্তক্ষেপ করে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে হাসপাতালের পেয়িং শয্যায় বিনা পয়সায় থাকেন।

হাসপাতালের অভ্যন্তরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার : সব পর্যায়ের হাসপাতালেই দালালদের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা অর্থের বিনিময়ে দালালদের কাছে থেকে সহায়তা পেয়ে থাকেন, আবার সহায়তার পরিবর্তে হয়রানির শিকার হন। পাশাপাশি কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যও চিকিৎসার পরিবেশ ব্যাহত করে।

রোগীর সাথে অধিকসংখ্যক ভিজিটর থাকায় হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

২.৩.১০ *তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা*

রোগীদের তথ্য সরবরাহে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র নেই, অভিযোগ বাক্স নেই, কর্তব্যরত চিকিৎসকদের তালিকা ও নাগরিক সনদ টাঙানো নেই।

২.৩.১১ *স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম*

হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত হয় না। যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

২.৩.১২ *মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য*

অ্যাম্বুলেন্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অরগানাইজেশন (টেমো)। টেমোতে রাজস্ব খাতের সব গাড়ি মেরামত করা হয়। দেখা যায়, জনবল স্বল্পতায় বিকল অ্যাম্বুলেন্স মেরামত করতে দীর্ঘ সময় লাগে। অন্যদিকে চিকিৎসকদের আবাসন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং পণ্য রক্ষণাবেক্ষণে স্টোরেজ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে এ সমস্যাটি প্রকট। ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালগুলোতে তদারকি ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর নয়।

৩.১ অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

৩.১.১ *নিয়োগ-সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি*

অ্যাডহক চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হয়। নিয়োগে দলীয় তদবিরের পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়। তা ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে কর্মচারী নিয়োগেও দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়ে থাকে। এসব নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়োগ প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং নিয়োগ প্রদানের আশ্বাসে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

অ্যাডহক চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ ও অর্থ লেনদেন হয় স্বাচিপ বা স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা, কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা, অফিস প্রধান সহকারী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে।

৩.১.২ *বদলি-সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি*

চিকিৎসকদের প্রতি স্টেশনে চাকরিকাল তিন বছর এবং দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর থাকার নিয়মটি মানা হয় না। দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কর্মচারীদের মধ্যে বদলি নিতে আগ্রহী প্রার্থী তদবির ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পছন্দমতো স্থানে বদলি নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, কর্মচারীরা দীর্ঘদিন একই জায়গায় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে চিকিৎসাসেবা– প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। বদলিতে অর্থের লেনদেন হয় সিভিল সার্জন অফিস ও অধিদপ্তর পর্যায়ে।

৩.১.৩ *পদোন্নতি-সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি*

ডিপিসি ও এসএসবির মাধ্যমে পদোন্নতিতে দলীয় তদবির প্রাধান্য পায়। ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন হয়। পদোন্নতিতে নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে পদবি, পদবির সংখ্যা, কোন বিষয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হবেন– তার ওপর। ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতিতে যে ধরনের অনিয়ম করা হয়– চাকরির অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা বিবেচনা না করা, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা, প্রকাশনাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন না করা, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাস বিবেচনা না করা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক কি না, তা বিবেচনা না করা।

৩.১.৪ *প্রশিক্ষণ-সম্পর্কিত অনিয়ম*

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয় না। একই ব্যক্তির একাধিক প্রশিক্ষণ বা একই বিষয়ের প্রশিক্ষণে একই ব্যক্তি একাধিকবার সুযোগ পায়। এতে সবাই যেমন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তি আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

সারণি ৩.১ : জনবল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

নিয়োগ	টাকা
অ্যাডহক চিকিৎসক	৩-৫ লাখ
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	১-৫ লাখ
বদলি	
প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলায়	৫-১০ লাখ
চিকিৎসকদের উপজেলা ও সদর থেকে ঢাকায়	১-২ লাখ
দুর্গম এলাকা থেকে সদরে, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলা এবং উপজেলা থেকে সদরে	১০-৫০ হাজার
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের	৫০ হাজার-২ লাখ
সুবিধাজনক স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্য	২.৫ লাখ বা তার ওপরে
পদোন্নতি	
ডিপিসির মাধ্যমে পদে	৫-১০ লাখ

৩.১.৫ *ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি*

পথ্য ক্রয় : পথ্যের সরবরাহকারী বাছাইয়ে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে আগ্রহী সব ঠিকাদারের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। ঠিকাদার দরপত্র কমিটির সদস্যদের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কাজ আদায় করে থাকে। সর্বনিম্ন মূল্য প্রদানকারী ঠিকাদারকে দরপত্র দেওয়া হলেও দরপত্রে ঠিকাদার কিছু কিছু সামগ্রীতে যেমন বাজারমূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান করে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও বাজারমূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করা হয়। এতে দরপত্রে উল্লিখিত দ্রব্যের সব ঠিকাদার যেমন সরবরাহ করেন না, তেমনি সমপরিমাণের দ্রব্যও সরবরাহ করা হয় না।

ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে : কোনো ক্ষেত্রে ইডিসিএল বরাবর নির্দিষ্ট ওষুধের চাহিদা পাঠানো হলেও তা সরবরাহ করা হয় না। ছয় মাস বা এরও কম মেয়াদ আছে– এ ধরনের ওষুধ আকস্মিক স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠাগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সরবরাহে অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিএমএসডি কর্তৃক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা না পাঠালেও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এতে স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে এসব যন্ত্রের সব ব্যবহৃত হয় না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও ওষুধ চাহিদার ভিত্তিতে ক্রয়ের বিভিন্ন শর্তাবলি উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি (২৪ জুন, ২০১৪) করা হয়।

চিকিৎসার যন্ত্রপাতি মেরামতে রয়েছে নিমিউ। নিমিউতে দক্ষ জনবলের যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সিএমএসডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশে নিমিউর কর্মকর্তা কমিশনের বিনিময়ে অনাপত্তিপত্র প্রদান করেন। ফলে বাইরের প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া হাসপাতালের ভবন মেরামত ও সংস্কারকাজে রয়েছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। সংস্কারকাজ যথার্থভাবে না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশ করে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিল তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩.১.৬ *সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি*

হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা গ্রহণে রোগীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়। এ প্রসঙ্গে ২০১১-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী দেখা যায়, উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম থাকলেও চিকিৎসকদের অনেকে কর্মস্থলে যেমন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না, তেমনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কোনো কোনো চিকিৎসক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থাকেন না। রোগীদের কিছু ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পান না, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের মেঝেতে থাকতে হয় এবং রোগীকে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বার বা বেসরকারি ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে পথ্য গ্রহণকারীর কেউ কেউ

পথ্যের মান সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেন। এ ছাড়া হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট সেবা পেতে নিয়মবহির্ভূত অর্থও দিতে হয়। যেমন– টিকিট কেনা, শয্যা বা কেবিন পেতে, ট্রলি ব্যবহারে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, ইনজেকশন ও স্যালাইন পুশে, অ্যাম্বুলেন্স সেবায়, আয়া ও ওয়ার্ডবয়দের সেবায় এবং ড্রেসিং সেবা প্রভৃতি। প্যাথলজি, রেডিওলজি বা অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে রোগীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া ব্যক্তির পছন্দের নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়।

৩.১.৭ *বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি*

অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুযায়ী বেসরকারি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে রোগীর অপারেশন, চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং প্রতি ১০ শয্যার জন্য একজন সার্বক্ষণিক নিবন্ধিত চিকিৎসক, দুজন নার্স ও একজন সুইপারের কথা বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান রাখা হয় না। চিকিৎসক কর্তৃক পরামর্শ ফির রসিদ রোগীকে প্রদান করার কথা বলা হলেও তা মানা হয় না এবং পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা নিবন্ধন সম্পর্কে বলা হলেও নাম লিপিবদ্ধ করা হলেও ঠিকানা করা হয় না।

চিকিৎসকদের সাথে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কমিশনভিত্তিক চুক্তি হয়ে থাকে। এ কমিশনের হার নির্ভর করে কোন চিকিৎসক কত সংখ্যক রোগী পাঠান তার ওপর। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা জানান, এ কমিশনের হার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়। একইভাবে দালালদের কমিশন ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে প্যাথলজিস্ট না রেখে তাদের সিল ব্যবহার করে, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি করে রোগীদের রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

নিবন্ধিত কোনো মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসক বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন কোনো নাম, পদবি, বিবরণ ব্যবহার বা প্রকাশ করে মেডিকেল প্র্যাকটিস করতে পারবে না বলা হলেও এটি মানা হয় না। চিকিৎসকদের অতিরিক্ত যোগ্যতা ও ভুয়া পদবি ব্যবহার করে মেডিকেল প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের যথাযথ প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে।

৩.২ স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ

স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণে বলা যায়, আইনের সীমাবদ্ধতা বা উপস্থিতি বা প্রয়োগের ঘাটতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংবেদনশীলতা ও তদারকির ঘাটতি। এ ছাড়া রয়েছে দলীয় রাজনীতিকীকরণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রভাব ফেলে। যেমন– নিয়োগ, বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতি কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীয়করণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশে চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসায় এবং ভুয়া চিকিৎসকদের প্রভাবে রোগীরা মৃত্যুঝুঁকিতে পড়ছেন। ফলে চিকিৎসাসেবার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে এবং বিদেশে চিকিৎসাসেবা নেওয়ার

প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের নিয়মবহির্ভূত অর্থও দিতে হয়। এতে রোগীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

চিত্র ১ : একনজরে সুশাসনের ঘাটতি : কারণ-ফলাফল-প্রভাব

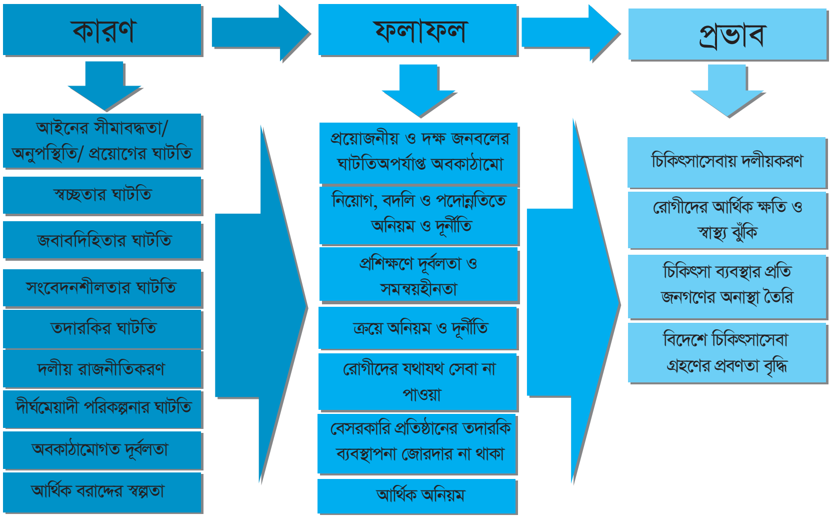

৩.৩ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার মান বৃদ্ধি পাবে; সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

আইন ও নীতিনির্ধারণী-সম্পর্কিত

১. **প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে–**
   - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইন লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি;
   - প্রদত্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠানের মান অনুযায়ী পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ;

২. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা বিষয়ক খসড়া আইন স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ও আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ-সংক্রান্ত

৩. জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. মোট বরাদ্দের মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন বাজেটের অনুপাতও বৃদ্ধি করতে হবে (উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান থাকলে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে)।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত

৫. সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, ইউএইচএফপিও, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট, সিনিয়র কনসালট্যান্ট প্রভৃতি শূন্য পদ পূরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে; প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে জনবল নিয়োগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে একটি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্য খাতের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিসহ সব ধরনের কর্মকাণ্ডে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৮. মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার (পারফরম্যান্স) ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থীর নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরকারি ওষুধ চুরি বন্ধে, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সেবা-সম্পর্কিত

১০. রোগীর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক কার্যক্রম চালু করতে হবে; নাগরিক সনদ, বিভাগ বা ওয়ার্ড ও সেবা প্রদানের অবস্থান নির্দেশকসহ তথ্য বোর্ড টাঙাতে হবে।

১১. চিকিৎসকের অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. বিএমডিসির ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত চিকিৎসকদের ডিগ্রি বা যোগ্যতাসহ তালিকা প্রকাশ ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এসএমএসের মাধ্যমে নিবন্ধিত চিকিৎসকের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৩. কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য–

- বসবাসের উপযোগী আবাসন-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রত্যন্ত এলাকার জন্য এবং ছুটিকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে;

১৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং সভা নিয়মিতকরণে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-সম্পর্কিত

১৫. ঠিকাদার নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সব ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং-প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

১৬. বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে সেবার ধরন, সেবা প্রদানে জনবল, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ধারণে একটি এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) তৈরি করতে হবে।

১৭. সরকারি হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেবাগ্রহীতা থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ (৫০ শতাংশ) জরুরি প্রয়োজনে (অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খরচের ক্ষমতা দিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অর্থবছর ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬; বাংলাদেশ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, বিশেষ অডিট রিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৮।

চাকরির বিধানাবলি, পঞ্চাশতম সংস্করণ, মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া ।

চাকরির বিধিমালা, সপ্তম সংস্করণ, বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

জাতীয় সেমিনার (জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যসেবা খাতের একটি পর্যালোচনা); উবিনীগ, স্বাস্থ্য অন্দোলন; ২৪.১১.২০১৩।

টিআইবি, সেবা খাতে দুর্নীতি, জাতীয় খানা জরিপ ২০১২।

টিআইবি, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, প্রকাশকাল : ০৭.১০.২০১৩, টিআইবি।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাজেট বক্তৃতা (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫), অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২), স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, গঠনতন্ত্র, স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারাসমূহ।

সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি ১০, ২০, ৩১, ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০, ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য জনবলের Standard Setup, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ২৩.১২.২০০৮।

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০১১, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০১৩, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় : জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভা, ০৩.০৭.২০১৩, টিআইবি।

Addressing corruption in the health sector, securing equitable access to health care for everyone, Karen Hussmann, U4 Issue, January 2011 No 1.

Annual Report-2011, Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh; www.cag.org.bd; Special/ Issue based Audit.

Governance of Rural Health Service Delivery, Case Studies of Three Upazil, Health Complex of Bangladesh, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla, june 2013

www.govindicators.org (accessed on 12/06/2014)

www.mohfw.gov.bd (accessed on 20/11/2013)

www.dgfpbd.org, (accessed on 24/06/2014)

www.edcl.gov.bd, (accessed on 24/06/2014)

www.heu.gov.bd (accessed on 20/06/2014)

www.bmdc.org.bd (accessed on 23/06/2014)

www.smf.edu.bd (accessed on 11/06/2014)

www.bps-bd.org (accessed on 11/06/2014)

www.mof.gov.bd (accessed on 6/06/2013 & 10/06/2013)

www.dghs.gov.bd (accessed on 24/07/2013)

www.pbsc.gov.bd (accessed on 24/07/2013)

www.mopa.gov.bd (accessed on 24/07/2013)

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস : প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়*

নিহার রঞ্জন রায়, নীনা শামসুন নাহার ও রুমানা শারমিন

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি স্তর শেষে মূল্যায়ন-পদ্ধতি এবং পরবর্তী স্তরে প্রবেশে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হওয়া, শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাওয়া এবং অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পরও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। তবে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা হলেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। টিআইবি যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে, শিক্ষা এর মধ্যে অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণাকার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ও এইচএসসি) পরীক্ষাগুলো গবেষণার আওতাভুক্ত। গবেষণায় পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ এবং প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন বা কর্তৃপক্ষের সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ও বিতরণের ক্ষেত্রে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৬২ জনের কাছ থেকে এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন মোট ৩২ জন তথ্য প্রদানকারী, যাদের মধ্যে

---

* ২০১৫ সালের ৫ আগস্ট টিআইবির ঢাকা কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত।

রয়েছেন শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিজি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা, তদন্ত কমিটির সদস্য, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কোচিং সেন্টারের মালিক, ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধি। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা, সরকারি প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

২.১ প্রশ্ন ফাঁস-সম্পর্কিত তথ্য

বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে এই প্রবণতা শুরু হয়। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ একটি নিয়মিত ঘটনা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চার বছরে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ৬৩টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পিইসিই ও জেএসসি পরীক্ষার সবগুলো পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়।

২.২ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আইন

প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে পৃথক কোনো আইন না থাকলেও পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) (সংশোধনী) আইন ১৯৯২, এর ধারা ৪ (ক) ও (খ)-এ কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রশ্নসংবলিত কোনো কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণা দিয়ে কোনো প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল আছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্নসংবলিত কোনো কাগজ যেকোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করলে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি বাতিল প্রভৃতি শাস্তির বিষয়ে বলা হয়েছে; নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ সাত বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ৬৩ (১, ২) প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২.৩ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

এখন পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার, চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ ও মামলা দায়ের, একটি পরীক্ষা ও একটি কেন্দ্র স্থগিত করা হয়। গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এ পর্যন্ত চারটি তদন্ত কমিটি গঠন করার তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া ২০১০ থেকে তদারকি ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে বিজি প্রেসে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শুধু পিইসিই

পরীক্ষা পরিবীক্ষণের জন্য ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৬৪ কর্মকর্তাকে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.৪ ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

পরীক্ষার কয়েক দিন আগে থেকে প্রশ্ন পাওয়ার খবর শোনা যায়। এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন পাওয়া যায়, যেগুলোর সাথে মূল প্রশ্ন আংশিক মিলে যায়, কিছু প্রশ্ন থাকে ভুয়া, যেগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকে যেসব প্রশ্ন পাওয়া যায়, সেগুলোর সাথে মূল প্রশ্নের সর্বাধিক মিলে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কে (বিশেষ করে যেসব উৎস প্রশ্ন সরবরাহ করার আশ্বাস দিয়েছিল, অথবা দিতে পারার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত) খবর রাখে এবং সম্ভাব্য সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রক্ষা করে। বহুনির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ছড়ানোর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় এই পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য বেশি পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগে গ্রামাঞ্চলেও প্রশ্ন পৌঁছে যায়।

২.৫ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ-প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি

২.৫.১ প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ পর্যায় : পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নির্দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করার জন্য শিক্ষক বাছাই করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রশ্ন প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম। শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এ বিষয়টিকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে ওই প্রশ্নগুলো দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের দ্বারা প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ রয়েছে। আবার মডারেশন পর্যায়ে প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ থেকে যায়।

২.৫.২ প্রশ্ন ছাপানোর পর্যায় : কম্পোজার প্রশ্ন দেখার সুযোগ পান বলে কম্পোজ করার সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কম্পোজ হয়ে গেলে সেটির প্রুফ দেখার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকে। ছাপানোর কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রশ্ন মুখস্থ করে প্রশ্ন ফাঁস করার তথ্য পাওয়া যায়। আবার কম্পোজের পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পোজার কর্তৃক সংরক্ষণের সময়ও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকার তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রণ কাজ শেষে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত আকার ধারণ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। ডিজিটাল পেপার কাউন্টার পদ্ধতি না থাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা

হলেও প্রশ্ন গণনা ও প্যাকেট করার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকে যায়। তা ছাড়া বিতরণের আগে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

২.৫.৩ প্রশ্ন বিতরণ পর্যায় : প্রশ্ন সংরক্ষণ ও বিতরণের সময় ছাপানো প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসকের (জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ থানা/ ব্যাংক) কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ফাঁস হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। থানায় বা ভল্টে সংরক্ষণ করে রাখার সময় রাতের বেলা পিয়নের কাছে চাবি দিয়ে তার হেফাজতে প্রশ্ন রাখা হয়; প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরীক্ষার আগের দিন ট্রাংক খুলে যাচাই করে দেখে পুনরায় সিলগালা করার সময় ও পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা ট্রাংকের ভেতরে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ওই দিনের জন্য নির্ধারিত সেটের প্রশ্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করার সময় অন্য বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নসহ ট্রাংক পুনরায় সিলগালা করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বহুনির্বাচনী অংশের প্রশ্নের প্যাকেট পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে খোলার নিয়ম থাকলেও এক থেকে দুই ঘণ্টা আগেই সিলগালা প্যাকেট খুলে হাতে লিখে বা মুঠোফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে খুদে বার্তা, ইমেইল, ফেসবুক, ভাইবারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে শিক্ষকদের একাংশের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করার সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস অধিক কার্যকর হচ্ছে। এমনকি সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন এক-দেড় ঘণ্টা আগে পাওয়া গেলেও তার উত্তর তৈরি করে পরীক্ষা দেওয়া খুবই সহজ। আবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেও প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য রয়েছে।

২.৬ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর মাধ্যম

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের একটি অংশের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কতিপয় কোচিং সেন্টার। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ ও ফটোকপি করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে বিতরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ লক্ষণীয়। গাইড বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সৃজনশীল অংশে হুবহু প্রশ্ন আকারে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের পরপরই বিতরণের জন্য ফটোকপির দোকানগুলো কাজ করে এবং অর্থের বিনিময়ে লাভবান হয়। ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেলে শিক্ষার্থী/ অভিভাবক/ বন্ধু-বান্ধব/আত্মীয়স্বজন সেগুলো অন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বেচ্ছায় প্রদান ও প্রচার করে। মোবাইল/ ওয়েবসাইট/ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর পরই ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট বা লিংকের (উত্তরসহ বা উত্তরছাড়া) মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

২.৭ প্রশ্ন ফাঁসে অর্থের সংশ্লিষ্টতা

প্রশ্ন প্রণয়নের সময় থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সংশ্লিষ্টদের সক্রিয় থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তারা মূলত প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রয়াস চালায়। তবে কোনো কোনো অংশীজনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াই প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওয়েবসাইটের লিংক আদান-প্রদানের সাথে যারা জড়িত এবং আত্মীয়স্বজনদের একাংশ যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য 'সাহায্য' করার নামে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করা বা শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করা ও বিতরণ এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্ন হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে ২০ টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিশোধের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের জন্য বিভিন্ন ধরনের চুক্তির বিষয়ে জানা যায়। ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেতে কখনো এককভাবে এবং কখনো গোষ্ঠীগতভাবে (যেমন– কোচিং সেন্টার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) অর্থের বিনিময় হয়ে থাকে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ লেনদেনের ঘটনা ঘটে। যেমন– মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন সরবরাহকারীকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়। আবার প্রশ্ন সরবরাহকারীকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবেও চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্নের ধরন, প্রশ্ন পাওয়ার সময়, স্থান ও প্রশ্ন প্রদানকারীভেদে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। যেমন– প্রশ্ন হাতে পাওয়ার আগে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, আবার প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর অর্থ পরিশোধ করা হয়, এমনকি পরীক্ষায় প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

২.৮ প্রশ্ন ফাঁসের কারণ

তদন্ত কমিটি গঠন ও পরীক্ষা স্থগিত করে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় 'সাজেশন কমন পড়া' আর 'প্রশ্ন ফাঁস' হওয়া এক নয় বলে যুক্তি দেখানো হয়। আইনের শাসনের ঘাটতি প্রশ্ন ফাঁসের মতো বিষয়টিকে উৎসাহিত করছে। তা ছাড়া দীর্ঘ প্রক্রিয়া, সময়সাপেক্ষ ও অধিক জনবল সম্পৃক্ততার ফলে পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। একই শিক্ষক প্রতিবছরই প্রশ্নপ্রণেতা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে প্রশ্ন দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। বিজি প্রেসে জনবলের ঘাটতি নিয়েই নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি পাবলিক পরীক্ষার (পিইসিই ও জেএসসি) প্রশ্ন ছাপানোর দায়িত্ব। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা, প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রশ্ন গণনার কাজ ম্যানুয়ালি করায় ঝুঁকির সৃষ্টি হচ্ছে। বিজি প্রেসে প্যাকেটজাত করার জন্য প্রশ্ন হাতে গণনা করার সময় প্রশ্ন দেখে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পিইসিই পরীক্ষায় একসেট প্রশ্ন থাকা অর্থাৎ বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হচ্ছে।

পরিবর্তিত শিক্ষা ও পরীক্ষাকাঠামোর ওপর শিক্ষকদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে সৃজনশীল অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি, পাঠদানের পরিবর্তে শিক্ষকদের ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ ও সরবরাহে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। 'তথাকথিত সাফল্যের ধারা' অব্যাহত

রাখতে এবং প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত হয় কোচিং সেন্টারগুলো। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতির কারণে প্রশ্ন ফাঁসে সামাজিক যোগাযোগ বা ফেসবুক, ইমেইল, ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক তাৎক্ষণিক সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেও প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

২.৯ প্রশ্ন ফাঁসের ফলাফল ও প্রভাব

একদিকে আসল প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে এবং অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁসের প্রপঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে সম্পৃক্তদের বাণিজ্য করতে দেখা যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশের 'তথাকথিত সুনাম' ও পাসের হার বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষার আগে প্রশ্ন কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার উদাহরণ রয়েছে। কোচিং ব্যবসার সাথে স্কুলের শিক্ষকরাও জড়িত থাকেন বলে দেখা যায়। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা ভেবে পাঠদানের চেয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করার চেষ্টায় অধিকতর মনোযোগী থাকেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া ও কম পরিশ্রমে ভালো ফল করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে সুষ্ঠু পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরেও প্রশ্ন ফাঁসের কারণে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়।

চিত্র ১ : প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ → **ফলাফল** → **প্রভাব**

কারণ

- নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করা
- আইনের প্রয়োগে শিথিলতা
- অত্যাধিক ধাপ, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও অধিক সংখ্যক ব্যাক্তির সম্পৃক্ততা
- তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা
- একই শিক্ষকের প্রতি বছর প্রশ্নপ্রণেতা হিসেবে নিয়োগ
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকির ঘাটতি
- যথাযথ প্রশিক্ষণের ঘাটতি
- পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা
- বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হওয়া
- ম্যানুয়ালি গণনা করায় ঝুঁকি সৃষ্টি
- প্রশ্ন ফাঁসের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতার ঘাটতি

ফলাফল

- অংশীজনের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশ্ন কেনার জন্য অর্থ আদায় করা
- কোচিং সেন্টারে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা
- পাঠদানের পরিবর্তে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহে অধিক মনোযোগ
- অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি ও পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি
- অতিরিক্ত পেশাগত চাপ বৃদ্ধি

প্রভাব

- নৈতিকতার অবক্ষয়
- শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি

প্রশ্ন ফাঁসের ফলে একটি নীতিহীন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থী থেকে সব ধরনের সুবিধাভোগী ও অংশীজনের মধ্যে প্রশ্ন পাওয়া, অন্যকে বিতরণ ও সর্বোপরি পুরো বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়ার মতো মানসিকতা লক্ষ করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে যা নীতিবিবর্জিত প্রজন্ম উপহার দেওয়ার মতো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পায়, যার বিরূপ প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে দেশের ওপর পড়তে পারে।

৩. উপসংহার

সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সরকারি ও বেসরকারি উভয় অংশীজনই জড়িত রয়েছে। প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে যেসব সরকারি অংশীজন জড়িত তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের কোনো না-কোনো পর্যায়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়। প্রশ্ন ফাঁস বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে। প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কোনো না-কোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকে। এ কারণে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না। প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ, ম্যানুয়াল এবং এর সাথে অনেক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। তিনটি পর্যায়ের মোট ১৮টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণে তদারকি ও সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন জড়িত থাকে। ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রয়াস দেখা যায় এবং ফাঁসকৃত প্রশ্ন বিনা মূল্যে ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ছড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন ফাঁসের জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা যায় না এবং প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে।

৩.১ সুপারিশ

এ পর্যায়ে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে, যা উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সরকারের সহায়ক হিসেবে অবদান রাখতে পারে :

১. প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট আইনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে :

- পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২'-এর ৪ ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা আগের ধারা অনুযায়ী পুনর্বহাল করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধকরণে সরকারের 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২-এর অস্পষ্টতা দূর করতে হবে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- প্রশ্ন ফাঁস রোধ ও সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাইডবইয়ের আদলে প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলি বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বাড়াতে হবে ও প্রচলিত আইনের অধীনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ধাপ কমাতে প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোনো তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. শিক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনাগত যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬. প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুনির্বাচনী প্রশ্নব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে তুলে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. পিইসিই পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট রাখতে হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. ওয়াহিদ আলম, নিহার রঞ্জন রায় ও নাজমুল হুদা মিনা

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ভূমি মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন ভূমি-সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রমে ঘুষের লেনদেন, ভূমি অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের যোগসাজশের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত প্রভাবশালী মহলের দ্বারা সাধারণ জনগণের ভূমি দখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল, ভূমিহীনদের খাস জমি বণ্টনে দুর্নীতি, বঞ্চনা ও ভূমিহীনদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১২'-এর ফলাফল অনুযায়ী ভূমি তৃতীয় শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৫৯ শতাংশ ভূমি সেবা গ্রহণে অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয় এবং এ খাতে জাতীয়ভাবে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ দুই হাজার ২৬১ কোটি টাকা। এ ছাড়া এ দেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারাধীন মামলার ৬০ শতাংশ হচ্ছে ভূমি-সংক্রান্ত এবং এ মামলার সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ।

বিগত কয়েক দশকে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমকে সংস্কার ও গণমুখী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকার তার আসন্ন সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়া সরকার ইতিমধ্যে ভূমি খাতে ডিজিটাইজেশনের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা এ খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রম গণমুখী হতে সহায়তা করবে। এতদসত্ত্বেও, বিভিন্ন গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে নানা ধরনের সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে বড় ধরনের শঙ্কা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির কারণে এ শঙ্কা ও উদ্বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভূমি খাতে সুশাসনের ঘাটতি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, যা এ খাতে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সংস্কার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

---

* ২০১৫ সালের ২৩ আগস্ট টিআইবির ঢাকা কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- ভূমি ব্যবস্থাপনাকাঠামো ও সেবা কার্যক্রমে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও সেবা প্রদানে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ চিহ্নিত করা এবং
- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম উন্নতকরণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে সুপারিশের প্রস্তাব করা।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবার ক্ষেত্রগুলো অনেক বিস্তৃত, ভূমি সেবায় কমপক্ষে ১৪টি ক্ষেত্র রয়েছে। এ গবেষণার পরিধি হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রধান সেবাগুলো যেমন– ভূমি জরিপ, নামজারি, ভূমি নিবন্ধন, ভূমি উন্নয়ন কর, কৃষি খাসজমি বরাদ্দ, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, ভূমি-সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা পরিচালনা ও নথিপত্র উত্তোলনে অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ ভূমি-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে, এ গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুশাসনগত চ্যালেঞ্জের ওপর একটি ধারণা প্রদান করে।

৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণগত পদ্ধতি, যেমন– মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে এসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। ভূমি খাত-সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, সরকারি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আইনজীবী, সাব-রেজিস্ট্রার, দলিললেখক, সেটেলম্যান্ট অফিসার, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও ভূমি সেবাগ্রহীতাদের তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

ভূমি খাত-সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও পরিপত্র, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং নিবন্ধন পরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বই, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই গবেষণার সব তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪. গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

৪.১ আইনি সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একাধিক আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও পরিপত্র অনুসরণ করা হয়। এ গবেষণায় ভূমি-সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০-এ উল্লেখ্য ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মাত্র এক সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ গঠন ও জরিপ-সংক্রান্ত বিচারের রায় প্রদানে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার অনুপস্থিতির ফলে ভূমি জরিপ-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধিক সময়ক্ষেপণ হচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেবাগ্রহীতারা সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ গবেষণায় আরও দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে দেওয়ানি আদালত ও ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া ভূমি-সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১২ সালে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রণীত হলেও এখনো পর্যন্ত এর বিধি প্রণীত হয়নি। ফলে ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় আইনজীবীরা এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে আগ্রহী হচ্ছেন না। এ ছাড়া ১৯৯৭ সালে প্রণীত কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালায় ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাস জমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বিধান রাখা হয়েছে এবং ফলে যেসব ভূমিহীন প্রান্তিক নারীর সক্ষম পুত্র নেই, তারা কৃষি খাস জমি পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৪.২ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.২.১ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের ঘাটতি

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম মূলত ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে এ তিনটি মন্ত্রণালয়ের বাইরে কমপক্ষে আরও ছয়টি মন্ত্রণালয় পরোক্ষভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, ভূমি-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নয়টি মন্ত্রণালয়ের জড়িত রয়েছে। একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত থাকার ফলে ভূমি-সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি জরিপ পরিচালনা, নামজারি সম্পাদন ও ভূমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়হীনতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত থাকার ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণে বিভিন্ন অফিসে যেতে হয়। ফলে সেবাগ্রহীতাদের অতিরিক্ত সময়, ভ্রমণ ও খরচ বৃদ্ধি পায়।

৪.২.২ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে জবাবদিহি-কাঠামোর অভাব

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমের জবাবদিহির কাঠামো শুধু প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া সেবা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহি সৃষ্টির ক্ষেত্র সীমিত। এখানে উল্লেখ্য, অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহি তৈরির জন্য সরকারি নির্দেশনায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এ কমিটিগুলোতে রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের

সংখ্যা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, এই কমিটিগুলোতে সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ সীমিত। এ ছাড়া কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না এবং যখন সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন কমিটির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য সভায় অনুপস্থিত থাকেন। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে যথাযথভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় না এবং ভূমিসেবার বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

৪.২.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি ও স্বল্পকালীন পদায়ন

মাঠপর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তাদের ঘন ঘন বদলি ও স্বল্পকালীন পদায়নের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাদের মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তাদের পদায়ন সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সীমিত থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি হওয়ার আগেই তাদের অন্য পদে বদলি করা হয়। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ থাকে না। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে যেহেতু তাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়, ফলে ভূমি-সংক্রান্ত সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নে সীমিত অভিজ্ঞতার কারণে তারা কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন না।

৪.২.৪ মাঠপর্যায়ের ভূমি-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমি ব্যবস্থাপনার বাইরে বিবিধ দায়িত্ব পালন

জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনাররা (ভূমি) ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু এসব কর্মকর্তা ভূমি ব্যবস্থাপনার বাইরেও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম, যেমন– বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ, জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন নিয়োগ কমিটিতে দায়িত্বপালন এবং মন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শনে সার্বক্ষণিক তদারকি সম্পন্ন করে থাকেন। ফলে ভূমি-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না।

৪.২.৫ সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ঘাটতি

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব সহকারী কমিশনারদের ওপর ন্যস্ত। সাধারণত এ দায়িত্বে পদায়িত হওয়ার আগে তাদের পেশাগত অভিজ্ঞতা দুই থেকে তিন বছরের হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভূমিবিষয়ক বিবিধ আইন, নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া ভূমি খাত-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে উপজেলা ভূমি অফিসের অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষ করে কানুনগো, সার্ভেয়ার ও তহশিলদারদের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

৪.২.৬ *পর্যাপ্ত মাঠ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের অভাব*

ভূমি সংস্কার বোর্ডের কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিস নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের বিধান থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় না। এসব কর্মকর্তার ভূমি-সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজের চাপ, প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবের কারণে ভূমি অফিস নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। এ ছাড়া মাঠ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের অভাব লক্ষণীয়।

৪.২.৭ *মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না হওয়া*

মাঠপর্যায়ের ভূমি অফিস থেকে ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারি, খাসজমি বরাদ্দের মতো ভূমি-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর বিধান রয়েছে। জেলা প্রশাসকের অফিস মাঠপর্যায়ের এ ধরনের প্রতিবেদন সংকলন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করে। পর্যাপ্ত জনবলের অভাবের কারণে এসব প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত পাঠানো হলেও তা সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। ফলে মাঠপর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোর সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.৩.১ *অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ*

ভূমি খাতের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ কম। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৩৪ দশমিক ২৫ কোটি টাকা; যার মধ্যে উন্নয়ন বরাদ্দ ১৬৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। জনগণের জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে এই বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও বিভিন্ন ভূমিসেবা উন্নতকরণে এই বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল। দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দের তুলনায় এই বরাদ্দ অতি নগণ্য।

প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দের ফলে ভূমি খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার, ডিজিটাইজেশন কর্মকাণ্ড, অবকাঠামো উন্নয়ন, অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও স্টেশনারির চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ভূমি খাতে ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রচুর বরাদ্দের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দেওয়া তথ্য মতে, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবাকার্যক্রমের ডিজিটাইজেশনের জন্য আগামী ১০ বছরের জন্য কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বরাদ্দ প্রয়োজন।

৪.৩.২ *জনবলের ঘাটতি*

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমে ব্যাপক জনবলের ঘাটতি রয়েছে। ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বিকভাবে প্রায় ৮ হাজার ৮০০ পদ শূন্য আছে, যা অনুমোদিত পদের প্রায় ৬০ শতাংশ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ৪৩ শতাংশ প্রথম শ্রেণি ও ৪৭ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির পদ খালি আছে। অন্যদিকে নিবন্ধন পরিদপ্তরে প্রথম শ্রেণির খালি পদের

হার ১৮ শতাংশ, যার অধিকাংশই সাব-রেজিস্ট্রি পদ। উল্লেখ্য, মাঠপর্যায়ের কিছু পদ, যেমন– কানুনগো ও তহশিলদারদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায় থেকে আদালতে মামলা দায়ের হয়। এসব মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই পদগুলোতে দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ আছে। এ ছাড়া জরিপ কাজে নিয়োজিত জরিপকর্মীরা অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। দ্রুত নগরায়ণ ও ভূমির নানাবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু অপরদিকে মাঠপর্যায়ে অনেক পদ শূন্য থাকায় সেবাগ্রহীতারা কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪.৩.৩ বিদ্যমান জনবলে দক্ষতার ঘাটতি

ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত এবং এ খাত-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের একাংশের নিজ নিজ কাজে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ঘাটতি আছে। এর ফলে ভূমি সেবা গ্রহীতারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার সেবাগ্রহীতাদের জন্য বিভিন্ন ভূমিসেবা সহজ করার লক্ষ্যে ডিজিটাইজেশনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ ধরনের ডিজিটাইজ সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনবলের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ভূমি জরিপ ও এ-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কাজেও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলের অভাব আছে।

৪.৩.৪ কার্যকর প্রশিক্ষণের অভাব

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমি ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান ও জরিপ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশের উন্নত ভূমি ব্যবস্থাপনা, জরিপ বিষয়ে দক্ষতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, ভূমি ও জরিপবিষয়ক আইনকানুন অনেক জটিল। এ ছাড়া ডিজিটাইজড ভূমিসেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ তথ্যপ্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৪.৩.৫ অবকাঠামোর ঘাটতি

চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতি ভূমি খাতের অন্যতম সীমাবদ্ধতা। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনো মাঠপর্যায়ের অধিকাংশ ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস জরাজীর্ণ, যা সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এসব অফিসে জায়গার স্বল্পতার কারণে ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন রেজিস্টার ও রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে কোনো কোনো ইউনিয়নে তহশিল অফিস নেই এবং অনেক উপজেলায় সেটেলম্যান্ট অফিস ভাড়াবাড়িতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪.৩.৬ লজিস্টিকস ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ঘাটতি

উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও তহশিল অফিসে বিভিন্ন ফরম, বালাম বই, দাখিলা বইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে, যা এসব অফিসের দৈনন্দিন কার্যসম্পাদন ও

সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া অফিসের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনে কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। ডিজিটাল ভূমি জরিপের জন্য উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির অভাব লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের অধিকাংশ ভূমি অফিসে পর্যাপ্ত পরিসরের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৪.৩.৭ ম্যানুয়াল তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ

সামগ্রিকভাবে ভূমি খাতে বিভিন্ন তথ্য ব্যবস্থ্যাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। গত এক শ বছরে বিভিন্ন জরিপ যেমন– ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সিএস), এস্টেট এক্যুইজিশন (এসএ) ও রিভিশনাল সার্ভে (আরএস) ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। জরিপ-সংক্রান্ত বিভিন্ন রেকর্ড ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বিভিন্ন দাপ্তরিক রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যক রেজিস্টার ব্যবহার এখনো বিদ্যমান। এসব তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিভিন্ন রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে এসব ভূমি অফিস সেবাগ্রহীতাদের কার্যকর সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী ও দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হয়।

৪.৩.৮ ভূমি খাতে সীমিত ও সমন্বয়হীন ডিজিটাইজেশন

ভূমি খাত-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সমগ্র ভূমি খাতে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি হ্রাস করে বিভিন্ন সেবা জনবান্ধব করা সম্ভব। সরকার এ খাতে ডিজিটাইজেশনের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি কোনো মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ভূমি খাতে চলমান বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন প্রকল্প পাইলট আকারে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব লক্ষণীয়। এখনো পর্যন্ত এ খাতের ডিজিটাইজেশনে সরকারের বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ-সংক্রান্ত বেশির ভাগ কর্মকাণ্ডই দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে ভূমি খাতে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া ভূমি রাজস্ব ও জরিপ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদনে অনীহা রয়েছে। ডিজিটাইজড তথা অনলাইন সেবা প্রদান করলে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস পাবে। তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আগ্রহী নয়।

৪.৩.৯ মাঠপর্যায়ে ভূমি-সংশ্লিষ্ট অফিসে নাগরিক সনদ ও তথ্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতি

২০০৮ সালে বিভিন্ন সরকারি সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সরকারি অফিসে সরকার নাগরিক সনদ প্রবর্তন করে। কিন্তু অধিকাংশ উপজেলা ভূমি অফিসে নাগরিক সনদ থাকলেও অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও তহশিল অফিসে নাগরিক সনদ নেই। অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি অফিসে একজন তথ্য কর্মকর্তা থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও তহশিল অফিসে তা নেই। ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা এসব অফিসের বিভিন্ন সেবা-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৪.৩.১০ ভূমি-সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে দেওয়ানি আদালতের সীমাবদ্ধতা

বিচারকের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘ প্রক্রিয়া ভূমি-সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া ভূমি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের একাংশের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতিও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। ফলে প্রতিটি ভূমি-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে অনেক সময়ের ব্যয় হয় এবং মামলার প্রতিটি স্তরে সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়।

৪.৪ ভূমি সেবায় পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.৪.১ জরিপ-প্রক্রিয়া অধিক সময়সাপেক্ষ

মাঠপর্যায়ে ভূমি জরিপ পরিচালনা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত রেকর্ড মুদ্রণ পর্যন্ত প্রায় ১০টি ধাপ বিদ্যমান। জরিপ আইন ১৯৪০ অনুযায়ী, একটি জেলায় ভূমি জরিপ সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, একটি জরিপ শুরু থেকে শেষ অর্থাৎ চূড়ান্ত রেকর্ড মুদ্রণ পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। মূলত মাঠপর্যায়ে কর্মরত জরিপকর্মীদের অনিয়ম-দুর্নীতি, জরিপ-প্রক্রিয়া সম্পাদনে অদক্ষ ও অস্থায়ী জনবল নিয়োগ, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির ঘাটতি এবং রিভিউ জরিপ পর্যায়ে প্রভাবশালীদের প্রভাবের কারণে ভূমি জরিপ-প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

৪.৪.২ নামজারি সম্পাদনে বহু ধাপ

ভূমি হস্তান্তরের নামজারি প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে আটটি ধাপ বিদ্যমান। নামজারির আবেদন উপজেলা ভূমি অফিসে উপস্থাপনের পর তা তহশিল অফিসে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়, যা সময়সাপেক্ষ। এ ছাড়া নামজারি সম্পাদনে আবেদনপত্রের সাথে একাধিক নথিপত্র, যেমন– হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন করের দাখিলা, খতিয়ান ও ভূমির মালিকানা-সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র সংযুক্ত করার বিধানের ফলে সেবাগ্রহীতাকে একাধিকবার ভূমি অফিসে যোগাযোগ করতে হয়। ফলে সেবাগ্রহীতাদের অতিরিক্ত সময়, যাতায়াত খরচসহ বিভিন্ন হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৪.৩ নামজারির উচ্চ ফি নির্ধারণ

১ জুলাই, ২০১৫ থেকে ভূমির নামজারি ফি ২৫০ টাকার পরিবর্তে ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত ফি সাধারণ ভূমির মালিকদের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নামজারীকরণে নিরুৎসাহিত করবে; যা ভবিষ্যতে ভূমির মালিকানা-স্বত্ব নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি তৈরি করবে। এ ছাড়া নামজারীকরণে ঘুষের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

৪.৪.৪ ভূমি রেজিস্ট্রেশন ফির উচ্চহার

ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ভূমির মালিকানা পরিবর্তনে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ফির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ফির হার যথাক্রমে ১০ ও ১২ শতাংশ। বিশেষ করে, শহরাঞ্চলে জমির মূল্য বেশি হওয়ায় এসব এলাকায় ভূমি হস্তান্তরে সেবাগ্রহীতাদের অনেক বেশি

রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। অধিক রেজিস্ট্রেশন ফির কারণে অধিকাংশ ভূমির ক্রেতা দলিল লেখকদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করে জমির মূল্য কম দেখায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভূমি ক্রয়ের প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্য দেখিয়ে থাকে। ফলে সরকার প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

৪.৪.৫ ভূমি রেজিস্ট্রেশনের আগে নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিধান

ভূমি রেজিস্ট্রেশনের আগে ভূমি বিক্রেতাকে অবশ্যই ভূমির নামজারি সম্পন্ন এবং সব বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে হয়। এসব কার্যসম্পাদনে উপজেলা ভূমি অফিস ও তহশিল অফিসে একাধিকবার যোগাযোগ করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা হয়রানির সম্মুখীন হয়। বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করতে না পারায় এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অনপুস্থিতি থাকায় রেজিস্ট্রেশনের আগে ভূমির মালিকদের জন্য এই বিধি এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে।

৪.৪.৬ ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পাদনে একাধিক নথিপত্র সংগ্রহে বিভিন্ন ভূমি অফিসে গমন

ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একাধিক নথিপত্র, যেমন– হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন করের দাখিলা, হালনাগাদ খতিয়ান সংযুক্তির বিধান আছে। কিন্তু এসব কাজে সেবাগ্রহীতাদের একাধিক ভূমি অফিসে যোগাযোগ করতে হয়; যার ফলে তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি যাতায়াত খরচও বৃদ্ধি পায় এবং হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। ভূমি রেকর্ড-সংক্রান্ত তথ্যের কপি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে না থাকার কারণে নানাবিধ নথিপত্রের সংযুক্তির বিধান আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৪.৪.৭ নিবন্ধিত দলিলের হুবহু নকল বালাম তোলার বিধান (বালাম তোলার বিধান কি সমস্যা?)

ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নের পর দলিলের হুবহু নকল বালাম বইয়ে তোলার বিধান রয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত নকলনবিশরা এ কাজ হাতে লিখে করে থাকেন। ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের দলিলের আসল কপি হাতে পেতে দুই থেকে তিন বছর সময় লেগে যায়।

৪.৪.৮ ভূমি উন্নয়ন করের অপেক্ষাকৃত কম হার

ভূমি উন্নয়ন করের হার অপেক্ষাকৃত কম (কিসের অপেক্ষায় কম)। সম্প্রতি ১ জুলাই, ২০১৫ এ সরকার পূর্বাপেক্ষা ভূমি উন্নয়ন কর প্রায় দ্বিগুণ নির্ধারণ করলেও করের হার এখনো অনেক কম। বিশেষ করে মেট্রোপলিটন এলাকায় এ করের হার অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং করের হার কম থাকায় এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় কম হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর হতে সরকার ৩৫৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে; যা সরকার কর্তৃক সংগৃহীত মোট রাজস্বের ০.০০২ শতাংশ।

৪.৪.৯ প্রত্যয়নকৃত খতিয়ান ও ম্যাপের কপি একমাত্র জেলা রেকর্ড রুম থেকে উত্তোলনের বিধান

ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে খতিয়ানের প্রত্যয়নকৃত কপি প্রয়োজন হয়, যা একমাত্র জেলা রেকর্ডরুম থেকে উত্তোলনের বিধান রাখা হয়েছে। ফলে রেকর্ডরুমের

কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালরা সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঘুষের বিনিময়ে এ ধরনের খতিয়ান সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার সেবাগ্রহীতাদের জেলা শহরে এ কাজে আসার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি যাতায়াতের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

৪.৪.১০ দ্বৈত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হাটবাজারের ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি

হাটবাজার নীতিমালা অনুযায়ী, হাটবাজারকেন্দ্রিক সব প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদানে জেলা প্রশাসক একক ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হাটবাজার ইজারা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন। এই দ্বৈত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হাটবাজারের ব্যবস্থাপনার কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং হাটবাজারের জায়গা স্বার্থান্বেষী মহল ইজারার নামে দখল করে নিচ্ছে।

৪.৫ ভূমি সেবায় অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানি

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সেবাগ্রহীতারা ভূমি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, ভূমি খাতে দুর্নীতি ইতিমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এ খাতের প্রতিটি সেবা পাওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতাদের অনিয়ম ও দুনীতির শিকার হতে হয়। ফলে ভূমি খাত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছে। দুনীতির কারণে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ও ব্যয় হচ্ছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ ও প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের যোগসাজশের কারণে সাধারণ ভূমির মালিকরা আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি জবরদখল হচ্ছে। এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে ভূমির বিরোধও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আদালতে মামলার জট সৃষ্টি হচ্ছে। ভূমি-সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা যেসব ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়, তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

৪.৫.১ ভূমি জরিপ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরিপকর্মীদের একাংশ ভূমি জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ও খতিয়ানে ভুল তথ্য প্রদানের ভয় দেখিয়ে ভূমির মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করে। এ ছাড়া জরিপ ম্যানুয়ালের নিয়ম লঙ্ঘন করে জরিপকর্মীরা মাঠে ভূমির মালিকদের মাঠ পর্চা মাঠে প্রদান না করে সেটেলম্যান্ট অফিস অথবা গোপন স্থান থেকে প্রদান করে, এবং এ সময়ে ঘুষের লেনদেন হয়ে থাকে বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। এ গবেষণায় আরও লক্ষ করা যায়, জরিপকর্মীরা ঘুষের বিনিময়ে খতিয়ান সংশোধন করে এবং খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত জমি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীদের নামে খতিয়ান প্রস্তুত করে। এখানে উল্লেখ্য, জরিপের সময় কোনো ভূমির মালিক উপস্থিত না থাকলে তার সম্পত্তি সঠিক যাচাই-বাছাই না করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৪.৫.২ নামজারি

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নামজারির আবেদন গ্রহণ করার দায়িত্ব উপজেলা ভূমি অফিসের থাকা সত্ত্বেও তহশিল অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঘুষের বিনিময়ে নামজারির

আবেদন গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ঘুষের প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়। আরও উল্লেখ্য, ভূমি কর্মকর্তারা ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতাবান ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডস সম্পত্তির নামজারির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নামজারির খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রদান করে না আবার অন্যদিকে ক্ষেত্রবিশেষ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্রুত নামজারির কাজ সম্পন্ন করে।

৪.৫.৩ ভূমি রেজিস্ট্রেশন

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমির ক্রেতারা রেজিস্ট্রেশন ফি কম দেওয়ার জন্য দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারদের যোগসাজশের মাধ্যমে ভূমির প্রকৃতি ও প্রকৃত ক্রয়মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ভূমির ক্রেতারা দলিল লেখক এবং সাব-রেজিস্ট্রারদের ঘুষ দেয়। এখানে উল্লেখ্য, সাব-রেজিস্ট্রারদের দায়িত্ব হচ্ছে দলিল লেখকদের তদারকি করা কিন্তু তারা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির ক্রেতারা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে হালনাগাদ নামজারির খতিয়ান ও ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলা ছাড়াই ভূমি রেজিস্ট্রেশন কাজ করে থাকে। গবেষণায় আরও লক্ষ করা যায়, দলিল লেখকরা দলিল লেখার জন্য ভূমির ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার-নির্ধারিত ফির বাইরে টাকা নিয়ে থাকে এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নাগরিক সনদ ও জমি রেজিস্ট্রেশনের ফির তালিকা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত না থাকার কারণে অধিকাংশ সাধারণ জনগণের এই ফি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার অভাব রয়েছে।

৪.৫.৪ ভূমি উন্নয়ন কর

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তহশিল অফিসের কর্মকর্তারা নিয়মবহির্ভূতভাবে ভূমির মালিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন করে ভূমি উন্নয়ন কর কম দেখায়। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ও চাপে তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে তহশিলদার কর্তৃক মিসকেস করতে বাধা প্রদান করা হয়;

- প্রয়োজনীয় সময়ে ভূমি উন্নয়ন করের হালনাগাদ দাখিলা উত্তোলনে সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করে ঘুষ আদায় করে; এবং
- সঠিক কর দাতা নির্ধারণে তহশিলদাররা নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করেন না।

৪.৫.৫ নথিপত্র উত্তোলন

এ গবেষণায় দেখা যায়, ভূমি রেকর্ড রুম, সেটেলম্যান্ট অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের খতিয়ান, ম্যাপ ও অন্যান্য ভূমি-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে। এ ছাড়া উপজেলা ভূমি অফিস ও তহশিল অফিসের কর্মচারীদের একাংশ নথিপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে দালাল হিসেবে কাজ করে।

এখানে আরও উল্লেখ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেকর্ডরুম ও উপজেলা ভূমি অফিসের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে ভূমিদস্যু ও স্বার্থান্বেষীরা জমির প্রকৃত রেকর্ড নষ্ট করে ও পাতা ছিঁড়ে ফেলে।

বক্স ১ : ভূমি সেবায় 'উমেদার' ও দালালের উপস্থিতি

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অপর্যাপ্ত জনবল ও বিভিন্ন পদে নিয়োগ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এবং সেবা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঠপর্যায়ের অধিকাংশ ভূমি অফিসে অস্থায়ীভাবে কিছু মানুষ কাজ করে যারা 'উমেদার' হিসেবে পরিচিত। এই উমেদারেরা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে থাকে। এ ছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি, রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন রেকর্ড ও ম্যাপের কপি উত্তোলনে তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সেটেলম্যান্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উমেদার, দলিল লেখক ও ভেন্ডরদের একাংশ দালাল হিসেবে কাজ করে এবং সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঘুষের প্যাকেজ নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

৪.৫.৫ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত

এ গবেষণায় দেখা যায়, ভূমিহীনদের মাঝে কৃষি খাসজমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ও মেম্বাররা প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীনদের পরিবর্তে নিজস্ব মানুষদের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দ করে। এ ছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দের পরিবর্তে অবৈধ দখলদারের সহযোগিতা করে থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদাররা খাসজমি দখল-সংক্রান্ত মামলার আদালতের রায় স্থগিত করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মামলার রায় না মেনে প্রভাবশালী, স্থানীয় ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশের যোগসাজশে তা দখলে রাখে। এ গবেষণায় আরও দেখা যায়, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিয়মিত খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও তা রেজিস্টারভুক্ত করে না। এখানে উল্লেখ্য, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস কর্তৃক খাসজমি বরাদ্দের জন্য প্রচার-প্রচারণার বিধান থাকলেও তা করা হয় না।

৪.৫.৭ হাটবাজার ব্যবস্থাপনা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে হাটবাজারের জমি দখল করে স্থায়ী অবকাঠামো বা বাসস্থান নির্মাণ করে এবং দখলকৃত জমির খতিয়ান বা মালিকানা স্বত্ব তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন অথবা পৌরসভা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে টেন্ডার বিক্রি করা হয় না এবং নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রভাবশালী, মেয়র ও ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কম মূল্যে হাটবাজার ইজারা গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে হাটবাজার ইজারা দেওয়ার আগে প্রচার-প্রচারণার নিয়ম থাকলেও নিজস্ব পছন্দনীয় ব্যক্তিদের ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে তা করা হয় না। এ

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে ভূমি অফিসের উদ্যোগে হাটবাজার নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয় না এবং হাটবাজার থেকে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হয় না। উল্লেখ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক অফিসের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে নির্ধারিত টোলমূল্যের পরিবর্তে অধিক টোলমূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৪.৫.৮ দেওয়ানি মামলা পরিচালনা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভূমি-সংক্রান্ত মামলার প্রতিটি স্তরে বাদী ও বিবাদীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট কোর্ট অফিশিয়ালরা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করে এবং কোনো কোনো আইনজীবী মামলার তারিখ ঘন ঘন পরিবর্তন করে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। এ গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি আইনজীবীরা মামলার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে সরকারের স্বার্থ বিসর্জন দেন এবং জিপি নিয়োগে দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

সারণি ১ : ভূমি সেবায় ও ভূমি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় ঘুষের লেনদেন

সেবার ধরন	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
ভূমি উন্নয়ন কর	১০০-১০,০০০
নামজারি	৩,০০০- ২,০০,০০০
রেজিস্ট্রেশন	১,০০০-৫০,০০০
খতিয়ান ও ম্যাপের নকল কপি উত্তোলন	২০০-১,০০০
খতিয়ান ও ম্যাপের প্রত্যয়নকৃত কপি উত্তোলন	২০০-১,০০০
দলিলের নকল উত্তোলন	৮০০-১,০০০
শহরাঞ্চলে ভূমি জরিপ (প্রতি শতাংশ)	৩,০০০-৫,০০০
গ্রমাাঞ্চলে ভূমি জরিপ (প্রতি বিঘা)	৫০০-১,০০০
৩০ ও ৩১ ধারায় খতিয়ান সংশোধনী	৪,০০০-৫,০০০
হাটবাজার ইজারা	১০,০০০-২০,০০,০০০
হাটবাজারে অতিরিক্ত টোল গ্রহণের বিরুদ্ধে যেকোনো তদন্ত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিহতকরণে	১০,০০০-২,০০,০০০
ভূমি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ (মামলা দায়ের ও আরজি গঠন, সমনজারি, ইস্যু গঠন, শুনানির তারিখ নির্ধারণ, শুনানি ও ডিক্রি প্রদান)	৩০০-১,০০০

৫. ভূমি খাতে নারীর অবস্থান

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে অধিকাংশ নারী ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনে নারীদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় কখনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। মাঠপর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোতে জেন্ডারবান্ধব সেবা প্রদানের জন্য কোনো ধরনের দিকনির্দেশনা নেই। ফলে নারীরা বিভিন্ন ভূমি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় অথবা দালালের ওপর নির্ভর করেন। টিআইবির 'নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক হারে ভূমি অফিসগুলোতে ঘুষ প্রদান করে থাকেন।

চিত্র ২ : ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

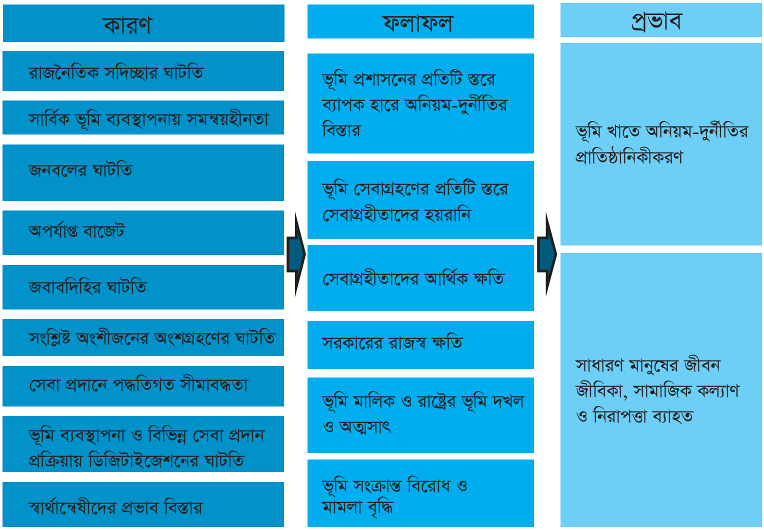

৬. উপসংহার

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও সেবা কার্যক্রমে নানা ধরনের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। ভূমি খাতের ব্যবস্থাপনাকাঠামো তিনটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত। ফলে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন ভূমি অফিস থেকে সেবা নিতে হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ঘাটতি রয়েছে। ফলে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হচ্ছে এবং সেবাগ্রহীতাদের জনবান্ধব সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। ভূমি খাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, যার ফলে ভূমি খাতের আধুনিকায়ন, বিশেষ করে ডিজিটাইজেশন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে ভূমি খাতের রেকর্ড ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে জনবান্ধব সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া মাঠ তদারকি ও জবাবদিহি ব্যাহত হয়। এ সমস্য সমাধানে ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিকে অন্যতম সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ খাতের

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম এখনো পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। সারা দেশে কত দিনের মধ্যে এবং কী কৌশলে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

ভূমি খাত অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত। ভূমি সেবার প্রতিটি পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের অনিয়ম-দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয় এবং অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ খাতের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচেটিয়া মনোভাব (মনোপলি) ও বিভিন্ন পর্যায়ের রাজস্ব কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকায় এ খাত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী ও কার্যকর জবাবদিহিকাঠামো দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া প্রশাসনিক জবাবদিহিকে দুর্বল করে তোলে। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামোকে অধিকতর কার্যকর করতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও মানসিকতার ঘাটতির কারণে বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় অংশীজনের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত।

ভূমি খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান এবং সরকারগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এসব চ্যালেঞ্জ দূর করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সরকার ভূমি খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভূমি খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলোয় জটিলতা থাকায় ও বিভিন্ন অংশীজনের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ থাকায় ভূমি খাতে যেকোনো ধরনের সংস্কার বাস্তবায়ন জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এই গবেষণায় ভূমি খাতের সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ ও তা নিরসনে নীতিনির্ধারণের চ্যালেঞ্জ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং টিআইবি আশা করে সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন ভূমি খাতের চিহ্নিত এসব সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ গুরুত্বের সাথে নিয়ে তা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৬. সুপারিশ

৬.১ মুখ্য সুপারিশ

১. ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি-সংক্রান্ত সব প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনার জন্য একক অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে;

২. ডিজিটালাইজেশনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা, রেজিস্ট্রেশন ও জরিপ ব্যবস্থায় সমন্বিত ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে;

৩. জাতীয় বাজেটে ভূমি খাতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখতে হবে, যা ভূমি ডিজিটালাইজেশন কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও দৈনন্দিন অফিস ব্যবহার্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

৬.২ অন্যান্য সুপারিশ

৪. ভূমি জরিপ কার্যক্রম, ভূমি প্রশাসন, নিবন্ধন পরিদপ্তর ও দেওয়ানি আদালতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে;

৫. ভূমি-সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ক্লাস্টারভিত্তিক পদায়ন ও পদোন্নতির বিবেচনা করতে হবে;

৬. উপজেলা পর্যায়ে সব সেবা, বিশেষ করে নামজারি, রেজিস্ট্রেশন, তথ্য সরবরাহ সেবাসহ অন্যান্য সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

৭. ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে বিচারিক জাজসহ ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ তৈরি করতে হবে;

৮. ২০১২ সালের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে;

৯. নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সব স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ (এনজিও, পেশাজীবী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ) নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং উপজেলা পর্যায়ে ভূমি সেবা কার্যক্রমের ওপর গণশুনানির আয়োজন করতে হবে;

১০. জনসাধারণকে ভূমি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি মেলার আয়োজন করতে হবে;

১১. সাম্প্রতিক সময়ে ঘোষিত নামজারির ফির উচ্চহার সংস্কার করে যুগোপযোগী ও যৌক্তিক ফি নির্ধারণ করতে হবে;

১২. ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাসজমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেসরকারি খাতে দুর্নীতি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, নীনা শামসুন নাহার, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আকতার ও মো. রবিউল ইসলাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান সঞ্চরণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) উভয় দলিলেই দেশে সব স্তরে মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার বিশেষ অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। প্রধান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চশিক্ষা প্রসারে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ও সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষা সুলভকরণ, চাকরির বাজার উপযোগী ডিগ্রির সুযোগ সৃষ্টি ও সেশনজটবিহীন স্বল্পসময়ে ডিগ্রি প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন : শিক্ষা, ২০১৩ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উদ্ভব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২২ বছরে বেশ কিছু ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, বাণিজ্যিকীকরণসহ নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে, অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি যে তিনটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে শিক্ষা খাত তার মধ্যে অন্যতম এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপরে গবেষণার অংশ হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে।

---

* ২০১৪ সালের ৩০ জুন ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা;

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনের সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;

৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা এবং

৪. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত আইন, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পরিচালনা বিধিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে এবং অংশীজন হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের সময়

মূলত এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে গবেষণার প্রয়োজনে প্রাথমিক ও পরোক্ষ উৎস থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধ বা প্রতিবেদন পর্যালোচনা। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হলো নমুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে দলীয় আলোচনা। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হলো সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রতিবেদন, নাগরিক সনদ, সংবাদমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন– শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ট্রাস্টি বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ভিসি, প্রো-ভিসি, সিন্ডিকেট সদস্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। দলীয় আলোচনাগুলো শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে করা হয়েছে। এ ছাড়া সব ধরনের অংশীজনের সমন্বয়ে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। মোট ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগ থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ১৮টি; ঢাকার বাইরে থেকে চারটি (চট্টগ্রামে দুই, সিলেটে দুই) নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, অবস্থান (ঢাকা ও ঢাকার বাইরে); বিশেষায়িত বনাম সাধারণ; স্থায়ী সনদ আছে এবং স্থায়ী সনদ নেই; নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে এবং নেই; এনজিও উদ্যোগ ও ব্যক্তি

উদ্যোগ; শিক্ষার্থী-অভিভাবকের পছন্দের তালিকা এবং পছন্দের বাইরের তালিকা। জুন ২০১২ থেকে মে ২০১৪ পর্যন্ত গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য

বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি। এর মধ্যে ২০০৩ ও ২০১২ সালে সর্বাধিক (১৬টি করে দুই বছরে ৩২টি) বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়। বিভাগীয় বিন্যাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৫৬টি (প্রায় ৭০ শতাংশ) বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিভাগে, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি, রাজশাহী বিভাগে পাঁচটি, সিলেট বিভাগে চারটি, খুলনা বিভাগে দুটি, বরিশাল বিভাগে একটি অবস্থিত। রংপুর বিভাগে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ধরন পর্যবেক্ষণে প্রধানত, ব্যবসায়ী প্রায় ২৯ দশমিক ৬ শতাংশ, শিক্ষাবিদ ২২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং রাজনীতিবিদ ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে (২০১২), 'ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বেশির ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী'।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থায়ী সনদ লাভ করেছে মাত্র দুটি। নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ১৭টি। নবায়নের সময়সীমাসহ মোট ১২ বছরের বেশি সময় অতিক্রম করেছে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাত বছর অতিক্রম করেছে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০১২ সালের তথ্যানুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬৪০ জন; ছাত্রী ৭৯ হাজার ২৩৪ জন (২৫ দশমিক ২ শতাংশ), ছাত্র ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪০৬ জন (৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ), বিদেশি শিক্ষার্থী এক হাজার ৬৪২ জন (শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ)। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৫৫ দশমিক ২২ শতাংশ, যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ, যা বর্তমানে (২০১২) যথাক্রমে ৩৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ৬১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। বিভাগ/ অনুষদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হার (২০১২) পর্যালোচনায়, ব্যবসায় প্রশাসন ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ; চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষিবিজ্ঞান ও ফার্মেসিতে ৩৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ; কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইনে ২৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ; সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১:২৬। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৫৫ জন, যেখানে পূর্ণকালীন শিক্ষক ৭ হাজার ৮২০ জন (৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ৩ হাজার ৯৩৫ জন (৩২ দশমিক ৫ শতাংশ)। নারী শিক্ষক রয়েছেন ৩ হাজার ৩২০ জন (পূর্ণকালীন : ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ ও খণ্ডকালীন ১৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ)। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু ব্যয় গড় ৭৮ হাজার ২৬৬ টাকা। বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ২১ হাজার ৪৭৪ জন। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৩ হাজার ৪১৯ জন

(২ দশমিক ৫৯ শতাংশ); দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ৭ হাজার ৬২১ জন (১৩ দশমিক ২৩ শতাংশ)। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরে (২০১২ সালে) সর্বমোট ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে ৪৯ হাজার ১৮০ জন শিক্ষার্থীকে (একটি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদান করেছে ২ হাজার ৮৭৪ জনকে এবং অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বনিম্ন একজনকে ডিগ্রি প্রদান করেছে)।

৩. সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পদক্ষেপ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অর্জন

৩.১ সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ

ইতিমধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন); অননুমোদিত প্রোগ্রাম বা কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশ; সব আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ (ইতিমধ্যে ৪০টি উচ্ছেদ); দীর্ঘসূত্রতা নিরসনে সব মামলা একই বেঞ্চে আনার উদ্যোগ; সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ; যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেনি, তাদের নতুন করে কোনো বিভাগ, প্রোগ্রাম, কোর্স অনুমোদন না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেপ্টেম্বর ২০১৫-এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া; ইউজিসির চারটি কমিটি সক্রিয় এবং আকস্মিক পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; ঢাকা শহরের মধ্যে নিজস্ব জমি না থাকলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনে অনুৎসাহের নীতি; অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত, সংসদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্দেশনা (মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়ম-দুর্নীতির ওপর ইউজিসি সত্যায়িত প্রতিবেদন পেশ) ইত্যাদি।

৩.২ সরকারের নেতিবাচক পদক্ষেপ বা উদ্যোগহীনতা

তবে ইতিবাচক উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের উদ্যোগহীনতা বা নেতিবাচক কিছু পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। সেগুলোর মধ্যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি না করা; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল বৃদ্ধি না করা; পৃথক একটি কমিশন গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইউজিসিকে অধিকতর ক্ষমতায়িত না করা; ২০১০-এর আইনে একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার কথা বলা হলেও চার বছরেও গঠন সম্পন্ন না করা। এ ছাড়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪-এর মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা; অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি (অবকাঠামো-সংক্রান্ত শর্ত শিথিল– নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস, কোন ধরনের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ পাবে তার মাপকাঠি অনির্ধারিত, ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের কাজের চাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি)।

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক অর্জন

গত ২২ বছরে ক্রমাগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে এর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থেকেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়সাপেক্ষ হলেও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে। অন্যান্য অর্জনের মধ্যে বিদেশগামিতার বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে প্রবেশ করছেন; অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে– বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের জন্য; দরিদ্র, মেধাবী বা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের জন্য বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি; বিদেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি (বর্তমানে ৩৪টি দেশের এক হাজার ৬৪২ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত); শুধু নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন-সুবিধা, নারীদের জন্য পৃথক আবাসিক সুবিধা; শিক্ষক যোগ্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে 'ডেমোনেস্ট্রেশন লেকচার বা বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা', শিক্ষা-শিখনে আধুনিক উপকরণ ও ধারার ব্যবহার– মাল্টিমিডিয়া /ওভারহেড প্রজেক্টর, ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান, প্রজেক্ট বা ফিল্ড ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি।

এ ছাড়া শিক্ষক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান, চাকরির বাজারে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন বিভাগ বা কোর্স চালু (বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োইনফরম্যাটিকস); চাকরির দুই বছর অতিক্রান্ত হলে শিক্ষকদের জন্য 'শিক্ষা ছুটির' সুযোগ, দরিদ্র, মেধাবী বা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বাধ্যতামূলক বৃত্তির বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি (একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিভোগীর গড় হার ৬০ শতাংশ), বোর্ড অব ট্রাস্টির ইতিবাচক উদ্যোগ ও ভূমিকার মাধ্যমে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইমেজ সৃষ্টি।

৫. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৫.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনিকাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেসব আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তার মধ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' উল্লেখযোগ্য। আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টির নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্বের ঝুঁকি সৃষ্টি, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাসরি আইনে উল্লেখ না থাকা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মালিকানাবোধ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক (ইউজিসি প্রতিবেদনে 'মালিকানা দ্বন্দ্ব' বলে উল্লেখ), ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সংখ্যা ও সম্মানী-সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা, সাধারণ তহবিল ব্যয়ের বিষয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে অর্থ ব্যয়ের নিয়ম থাকলেও তা কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে, তা উল্লেখ নেই; বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি না থাকায় অর্থ-সংক্রান্ত অস্বচ্ছতার ঝুঁকি সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। 'পর্যাপ্ত অবকাঠামোর' ব্যাখ্যা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অপব্যবহার, আসনসংখ্যা ও অবকাঠামোর অনুপাত সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা, অনুমোদনের ক্ষেত্রে অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় রাজধানীতে সীমিত এলাকায় ব্যাপকসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি, কারিকুলাম হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন নেওয়ার

বাধ্যবাধকতা না থাকা, বিধিমালার অনুপস্থিতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকির সৃষ্টি (‘আর্থসামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে’ সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী ফি কাঠামো, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ‘উপযুক্ত’ বেতনকাঠামো ইত্যাদি) হয়েছে।

৫.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.২.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবায়নকালীনসহ সর্বোচ্চ ১২ বছরের মধ্যে স্থায়ী সনদ গ্রহণ করার নিয়ম থাকলেও গ্রহণ না করা (২২টির মধ্যে মাত্র একটি), সাময়িক অনুমতি নিয়ে ও বারবার নবায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা; সীমিতসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা (২২টির মধ্যে মাত্র ছয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা); অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন-সম্পর্কিত সংবিধি তৈরি না করা বা করলেও অনুসরণ না করা; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ (মাত্র একটির ক্ষেত্রে বিওটি কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না, দুটির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হস্তক্ষেপ); অযৌক্তিকভাবে সভাসংখ্যা ও সম্মানী বৃদ্ধি এবং দেশের বাইরে সফরের আয়োজন; ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব– একাধিক বোর্ড গঠন, বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব দাবি (২২টির মধ্যে পাঁচটির ক্ষেত্রে); ট্রাস্টি বোর্ডে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য; দীর্ঘদিন অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা (৭৯টি মধ্যে ভিসি ৫২টি, ১৮টি প্রো-ভিসি, ৩০টিতে ট্রেজারার আছেন)।

শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সেলের অনুপস্থিতি ও তার বিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদনে না থাকা; সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেওয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্টে অর্ডার নেওয়ার পর ইউজিসিতে রিপোর্ট না করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা (বিশ্ববিদ্যালয়, অবৈধ ক্যাম্পাস ও কোর্স); না জানিয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম বোর্ডে অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবহার; প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে আকৃষ্ট করে ট্রাস্টি বোর্ডের নতুন সদস্য, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অবসরপ্রাপ্ত আমলা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি (একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে পূর্বনির্বাচন এবং অপর একটিতে বড় ধরনের দুর্নীতির পর রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তির কন্যাকে চাকরি প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়); কাগজে-কলমে শিক্ষকের কোটা পূরণ দেখালেও বাস্তবে শিক্ষকের উপস্থিতি না থাকা (শুধু শিক্ষকদের সিভি সংরক্ষিত রাখা); কাগজে-কলমে ঠিক থাকলেও বাস্তবে খণ্ডকালীন শিক্ষকের হার বেশি থাকা; শিক্ষকদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নে অনিয়ম (যোগ্যতার তুলনায় নিম্ন বা অতি মূল্যায়ন করা), কম যোগ্য ব্যক্তিকে বিভাগীয় প্রধান করা; ব্যস্ত রাস্তা, গার্মেন্টস কারখানা, বাণিজ্যিক ভবন ও অপরিসর রাস্তার পাশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত দেখানোর জন্য অবৈধভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের না জানিয়ে তাদের সিভি ব্যবহার; ভুয়া পিএইচডি ব্যবহার (ইউজিসি কর্তৃক ব্যবহারকারী ভিসি চিহ্নিত); শর্তপূরণ না করা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক

হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা; বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা-সংক্রান্ত কাঠামো না থাকা (বিজ্ঞাপনের তুলনায় কম বেতন প্রস্তাব করা), কাগজে-কলমে বেশি দেখিয়ে বাস্তবে কম দেওয়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা রেফারেন্সের ভিত্তিতে বেতনের পরিমাণ নির্ধারণ, ছুটি-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা না থাকা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া); অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী গবেষণা প্রকল্প খাতে অর্থ বরাদ্দ না রাখা (২২টির মধ্যে ১৩টিতে প্রকল্প নেই; সরকারি আদেশে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হলেও, সেলের জন্য নির্ধারিত অফিসকক্ষ নেই এবং সাধারণ শিক্ষার্থী এই সেলের বিষয়ে কিছুই জানেন না; আইনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা করার কথা উল্লেখ থাকলেও তা না করা উল্লেখযোগ্য।

৫.২.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা (ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি পর্যন্ত অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে– ইউনিয়ন পর্যায়েও) করেছে; তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা নিজেই দাবি করেন যে তাদের শাখা ক্যাম্পাসের সংখ্যা কয়েক শ)। সরকারি আদেশে কিছু আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হলেও, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভর্তি ও পরামর্শ কেন্দ্র'র নামে আউটার ক্যাম্পাস চালু রাখা; ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান (একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি তিন লাখ করে টাকার বিনিময়ে সনদ প্রদান); ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোর্স কারিকুলাম পড়ানো, বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অনুমোদন; সান্ধ্যকালীন ও এক্সিকিউটিভ কোর্সগুলোর ক্ষেত্রে ক্লাস না করিয়েও পরীক্ষা গ্রহণ; কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বই দেখে লেখা, অল্পসংখ্যক প্রশ্নের সাজেশনসহ পরীক্ষায় পাস করানোর নিশ্চয়তা দেওয়া উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শিক্ষকদের ব্যক্তি উদ্যোগে যাওয়া সেমিনার পেপার, জার্নালে লেখা ও শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের থিসিস পেপারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলে চালানো– গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেখিয়ে আত্মসাতের কথা জানা যায়। অন্যদিকে ভর্তির সময় উল্লিখিত টিউশন ফির চেয়ে অধিক আদায়, পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত না করে বৃদ্ধি করার (সেমিস্টার ফি, অ্যাসাইনমেন্ট ফি, কোর্স রিটেক ফি, ফি অনাদায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায়) অভিযোগ রয়েছে।

অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে ইউজিসিকে না জানিয়ে তহবিলের টাকা ট্রাস্টি কর্তৃক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার (অন্য ব্যবসায় খাটানো), বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভুয়া কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ও আত্মসাৎ, অনুমোদনের জন্য ইউজিসিকে সংরক্ষিত তহবিলের ভুয়া রসিদ প্রদান (তিন কোটি টাকা), ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগে প্রভাব, অর্থ লেনদেন, স্বজনপ্রীতি; সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার (কম্পিউটার, প্রকাশনা, নির্মাণ ও এসি ব্যবসা)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বেশির ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী)। এ ছাড়া ব্যবসায়িক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ও জনবল ব্যবহার; সরকারি নির্দেশনা না মেনে নিবন্ধনের

নথিতে অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে জমি ক্রয়, অবৈধভাবে অতিরিক্ত জমি ক্রয়-বিক্রয়; আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানো ও সঠিক চিত্র প্রতিফলন না করা, সমঝোতার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি; অনিয়ম ও দুর্নীতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়ন (ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার এবং সিন্ডিকেট ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মনোনীত সদস্য ইত্যাদি পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে); সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নানাভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন; যেমন– ইউজিসির নির্দেশনা অনুসারে দুটির অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা নিষিদ্ধ থাকলেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পৃক্ত থাকা; পরীক্ষার নির্ধারিত প্রশ্ন পরীক্ষার আগে বলে দেওয়া ও সেই অনুসারে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান; পাঠদান না করে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদানে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও অর্থ গ্রহণ; যৌন হয়রানি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি (শৃঙ্খলা কমিটি ও বিওটি কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ না থাকা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়গুলো বিরাজমান রাখা); শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উপঢৌকন ও নগদ অর্থ গ্রহণ করে পাস করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে পাঠ গ্রহণ না করে বা পরীক্ষা প্রদান না করে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির বিষয় গোপন রাখা (বিশেষ করে চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার), শিক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া বা পাস করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ, শিক্ষকদের অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতির হুমকি ও হয়রানি (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগের মাধ্যমে), শ্রেণিকক্ষ, টেবিল-চেয়ার ভাঙচুর ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যক্তিগত টাকা ব্যয় করে পড়ছে তাই পাস করিয়ে দিতেই হবে– এ ধরনের মানসিকতা প্রদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ ও পরীক্ষা প্রদান করতে হবে না জেনে ভর্তি হওয়া ও সার্টিফিকেট ক্রয় উল্লেখযোগ্য।

৫.২.৪ অন্যান্য পর্যবেক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন-সুবিধা নেই, কমনরুম-সুবিধা অপ্রতুল এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আলাদা কমনরুম নেই, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া বা ক্যানটিন সুবিধা ও চিকিৎসক বা প্রাথমিক চিকিৎসা-সুবিধা নেই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরিসর ও অপর্যাপ্ত ল্যাব-সুবিধা, লাইব্রেরি থাকলেও অপর্যাপ্ত বই, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা ইউনিটগুলোর ভৌত সুযোগ-সুবিধা নিম্নমানের। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়ভেদে টিউশন ফির ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয়; যেমন– বিবিএর জন্য সর্বনিম্ন দুই লাখ ৫০ হাজার, সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ ৫০ হাজার (পার্থক্য তিন লাখ); সিএসই সর্বনিম্ন দুই লাখ ৫০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ছয় লাখ ৩০ হাজার (পার্থক্য তিন লাখ ৮০ হাজার); এমবিএ সর্বনিম্ন ৭৫ হাজার; সর্বোচ্চ তিন লাখ ৩০ হাজার, (পার্থক্য দুই লাখ ৫৫ হাজার)। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু ব্যয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ৯ হাজার ৩৫৮ এবং সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ (পার্থক্য পাঁচ লাখ ৩৪ হাজার ২৫১)।

৬. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

৬.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটির জনবলের অভাব (অনুমোদন, সুপারিশ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, অডিট পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্য কর্মরত জনবল মাত্র সাতজন); মামলা-সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা, শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করা ও সনদ বাতিল করার মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারা; আইন লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম চালিয়ে গেলে শাস্তি প্রদান না করে বারবার আলটিমেটাম দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করা (নিজস্ব জমি ক্রয়, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময়সীমা ও আউটার ক্যাম্পাস গঠন বন্ধ); স্থায়ী সনদের জন্য চাপ প্রদান না করা; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিশেষ চিহ্ন দিয়ে অনুমোদনের ইঙ্গিত প্রদান, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ লেনদেন; ঘুষ প্রদান না করলে কাজ সম্পন্ন না হওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে কাগজপত্র গায়েব করা; মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসাজশে ইউজিসি কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ অদৃশ্য উপায়ে মীমাংসা হওয়া উল্লেখযোগ্য।

৬.২ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিদর্শন ও তদারকির সার্বিক দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হলেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় শুধু পরিদর্শন শেষে সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব (ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকা), শুধু পরিদর্শন শেষে সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকা; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পৃথক বিধিমালার অভাব; জনবলের অভাব– ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও তদারকি করার ব্যাপক দায়িত্ব পালনের জন্য মোট জনবল মাত্র ১৩ জন, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য (মেম্বার) মাত্র একজন; অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে অসহায়ত্ব কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক অর্থ ব্যয় করে নিয়োগকৃত দক্ষ আইনজীবীর সাথে সরকারপক্ষীয় আইনজীবীর দুর্বল অবস্থান (প্যানেল আইনজীবীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগসাজশ); পরিদর্শন ও তদারকির কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকা (আইনে না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়প্রতি ইউজিসির বার্ষিক এক লাখ টাকা নির্ধারণ)।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও পরিবর্তনে ইউজিসির অবহেলা এবং বাধ্যতামূলক ভূমিকা না থাকা; ইউজিসি পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আধিক্যের ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঝুঁকি সৃষ্টি; কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নমনীয়তা প্রদর্শন (শীর্ষ স্থানীয় খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতিবেদন সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া; ইউজিসির সংশ্লিষ্ট দলিল বা প্রতিবেদনে 'মালিকানা দন্দ্ব' 'মালিক' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে খাতটি মুনাফাভিত্তিক– এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করা; বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি; ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা (বিধি ও নীতিমালা না থাকা); ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক তদারকি না করা (বার্ষিক চিঠি ও ফরম্যাট পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করা); পরিদর্শনের সময় এবং বিভিন্ন

উপলক্ষে উপঢৌকন ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ; পরিদর্শন শেষে সঠিকভাবে প্রতিবেদন না দেওয়া (অর্থের বিনিময়ে তথ্য গোপন রাখা এবং অবৈধ অর্থ আদায়ের জন্য সমস্যাগুলো জিইয়ে রাখা); শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাজে সমন্বয়হীনতা ও সুপারিশ আমলে না আনার (মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত কমিশনে না জানানো) অভিযোগ রয়েছে।

৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে লেনদেন হয়, সেগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনের জন্য এক কোটি থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত; ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার নিয়োগের অনুমোদনের জন্য ৫০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পরিদর্শনের জন্য ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা, অনুষদ অনুমোদনের জন্য ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা, বিভাগ অনুমোদনের জন্য ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা, পাঠ্যক্রম অনুমোদন ও দ্রুত অনুমোদনের জন্য পাঁচ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা, ভুয়া সার্টিফিকেটের জন্য ৫০ হাজার থেকে তিন লাখ টাকা; টাকা দিয়ে অডিট করানো হয় ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ এবং অ্যাসাইনমেন্টবাবদ ৫০০ টাকা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার পর্যবেক্ষণে সার্বিকভাবে আইনের সীমাবদ্ধতা, অস্পষ্টতা এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অলাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফাভিত্তিক খাতে পরিণত (ইউজিসি প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় 'মালিক' 'মালিকানা দ্বন্দ্ব' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার); বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুযোগ; ভিসি, প্রো-ভিসি, সিন্ডিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলংকারিক/ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নামমাত্র ভূমিকা; স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, তদারকি ও সমন্বয়হীনতার অভাবে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির উদ্ভব ও প্রসার; কার্যত মুনাফাভিত্তিকে পরিণত হওয়ায় ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব, ক্যাম্পাস দখল ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট; উদ্যোক্তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তদারকি বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব; শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অপর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় সুষ্ঠু তদারকির অভাব; অনুমোদনসহ ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতির উদ্ভব ঘটেছে।

৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ পর্যালোচনায় আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের অভাব; প্রতিষ্ঠাতাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব; তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়হীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি; আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

ফলে, বোর্ডের একাধিপত্য, অলাভজনক হলেও মুনাফাভিত্তিতে পরিণত, সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি, সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ও সংবিধির অনুপস্থিতিতে অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতি, সমঝোতামূলক দুর্নীতি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অংশীজন কর্তৃপক্ষের একাংশের যোগসাজশে অনিয়মের মাত্রা বৃদ্ধি, অব্যাহত দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন ঘটছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ ফলাফল পর্যালোচনায় যেসব উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে সেগুলো হলো, গবেষণাভিত্তিক- জ্ঞানবিচ্যুত উচ্চশিক্ষার ধারা সৃষ্টি, দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অনুল্লেখযোগ্য অবদান, শিক্ষা খাতে বৈষম্য, নৈতিকতার অবক্ষয়, দুর্নীতির বিস্তার, প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারা।

১০. সুপারিশ

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. অবিলম্বে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড অব ট্রাস্টির একক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যে কমিটি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত রিভিউ এবং নিশ্চিত করবে।

৫. নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে ইউজিসির জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইউজিসির এখতিয়ার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সব ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সব ধরনের আউটার ক্যাম্পাসগুলোর কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি-প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করতে হবে।

৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত সনদ প্রদানের আগে বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষককে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব ধরনের আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. ভিসি, প্রো-ভিসি ও অন্যান্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন করতে হবে।

১১. অডিট প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য উন্মুক্ত ও প্রবেশযোগ্য করতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তথ্য কর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১২. খণ্ডকালীন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে আইনানুযায়ী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৩. সাধারণ তহবিল হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সংক্রান্ত উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ তহবিল ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইউজিসিতে নিয়মিত প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা এবং ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফি-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বেতন ও ফি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য একই ধরনের শর্তাবলি যুক্ত করতে হবে এবং কেবলমাত্র উচ্চ রেটিংসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই অনুমতি দিতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজিসির লোকবল, আইনি এখতিয়ার ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের অংশীজনের, যেমন– নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, অভিভাবক ইত্যাদির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

তৈরি পোশাক খাত : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*

ড. সাদিদ আহমেদ নূরে মাওলা, শরীফ আহমদ চৌধুরী ও নাজমুল হুদা মিনা

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ খাত থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ রপ্তানির ৭৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ অর্জিত হয়, জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ, যা সম্পূরক শিল্প মিলে প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ। দেশের মোট কর্মশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক (প্রায় ৪০ লাখ) এ খাতে কর্মরত, যার প্রায় ৮৫ শতাংশ নারী। খাতটিকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানকারী এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। তবে তৈরি পোশাক খাতের অর্থনৈতিক সাফল্য এ খাতের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ করে না। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধা প্রদান করা হলেও এ খাতের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। কারখানার অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কর্মাবস্থা এবং সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি এ অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্ঘটনা, সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ববরণ, শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থা, যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি-সুবিধা বাতিল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি বাতিলের হুমকি অথবা সাধারণ ক্রেতাদের বাংলাদেশি পণ্য বর্জনের আন্দোলন ইত্যাদির সম্মুখীন করছে। এ অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তৈরি পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এবং ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অনেক গবেষণা হলেও এ খাতের সুশাসন ও দুর্নীতি সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন নিয়ে এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. তৈরি পোশাক খাতের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা;

২. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা;

৩. তৈরি পোশাক খাতে প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা এবং

---

* ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

৪. চিহ্নিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও কমপ্লায়েন্স-বিষয়ক বিষয়াবলি এবং খাতসংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা গবেষণার আওতাভুক্ত। তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত ১৭টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজউক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজন হিসেবে কারখানার মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং বায়ার এ গবেষণার আওতাভুক্ত।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের সময়

এ গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে চেক লিস্টের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, আদালতের রায়, বই, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. আইনিকাঠামো পর্যালোচনা

২.১ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাত পরিচালিত হতো, যা ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়। সম্প্রতি তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ধসের কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে বর্তমান সরকার শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ বছর ২২ জুলাই ২০১৩ আইনটি পুনরায় সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে– গ্রুপ বিমা, কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও সব তৈরি পোশাক কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগে বাধ্যবাধকতা, প্রসূতি কল্যাণে বাধা দিলে মালিকের অর্থদণ্ড বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদনের কপি মালিককে দেওয়ার বিধান রহিত করা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে :

- তৈরি পোশাক খাতের জন্য কোনো বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি;
- কারখানা পরিদর্শকদের জবাবদিহির কোনো বিধান উল্লেখ করা হয়নি;
- দুর্ঘটনার জন্য মালিকপক্ষের শাস্তি অপর্যাপ্ত। এ ছাড়া শ্রম আদালতের সদস্য নিয়োগে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি মনোনয়নে [ধারা ২১৪ (৬, ৭, ৯)] সরকারের একক কর্তৃত্ব থাকায় রাজনৈতিক দলীয়করণ ও বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি রয়েছে;

- দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ বাবদ এক লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে এক লাখ ২৫ হাজার এবং কিশোর শ্রমিকের (১৪-১৮ বছর) জন্য ১০ হাজার টাকা প্রদানের বিধান রয়েছে, যা অপর্যাপ্ত ও অমানবিক;
- 'শ্রমিক'-এর সংজ্ঞায় 'তদারকি কর্মকর্তা' যুক্ত করে শ্রমিকের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দেওয়া (ধারা ২) হয়েছে;
- শত ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে– মোট মুনাফার ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের 'সুবিধাভোগীদের' মধ্যে বণ্টন করার বিধান রহিত করে বিধি দ্বারা খাতভিত্তিক তহবিল গঠনের কথা বলা হলেও বিধি প্রণয়ন করা হয়নি [ধারা ২৩২ (৩)];
- পাঁচ বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন করে মজুরি পুনর্নির্ধারণ করার বিধান বর্তমান জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- কারখানা স্থাপনের কত দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম মহাপরিচালক 'সন্তুষ্ট' হলে নিবন্ধন প্রদান করেন (ধারা ১৭৯), কিন্তু সন্তুষ্ট শব্দের কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কারখানা পর্যায়ে মালিক-শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'কে আইনে গুরুত্বারোপের কারণে মালিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প (বা প্রতিপক্ষ) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার [ধারা ২০৫] প্রবণতা তৈরি হচ্ছে;
- ন্যূনতম ৩০ শতাংশ শ্রমিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন গঠনের বিধান [ধারা ১৭৯(২)], যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত নয় এবং যা একই সাথে আইএলও কনভেনশন '৮৭ ও '৯৮ [Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (3); Right to Organize and Collective Bargaining Convention (2, 3)] অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- কর্মস্থলে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, আলো, পান করার পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদির কথা বলা হলেও 'পর্যাপ্ত' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি রয়েছে;
- শ্রমিক সরবরাহকারী 'ঠিকাদার সংস্থা রেজিস্ট্রেশন' সন্নিবেশ [ধারা (৩ক)] করায় মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে;
- ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য মজুরি কর্তন (ধারা ১২৬), অননুমোদিত অনুপস্থিতি (ধারা ১২৫) এবং 'অসদাচরণের' কারণে মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ছাড়া শ্রমিক বরখাস্তের বিধান (ধারা ২৩) আইএলও কনভেনশন ২৯ ও ১০৫ (Forced Labor Convention; Abolition of Forced Labor Convention) লঙ্ঘন করে।

৩. তৈরি পোশাক খাতে জড়িত অংশীজনদের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপনে সরকারের ১৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের একাধিক সনদ গ্রহণ করতে হয়। সনদ বা তালিকা ভুক্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি ফির অতিরিক্ত টাকা প্রদান

করতে হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের হিসাবমতে, তৈরি পোশাক কারখানার একজন মালিককে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে প্রায় সাত থেকে ২০ লাখ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়। নিচে গবেষণাভুক্ত অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.১ কারখানার মালিক

তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা মালিক ও মালিক সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব। মালিক কর্তৃক কারখানা পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ধরন নিচে আলোচনা করা হলো। মালিক কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

৩.১.১ *টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অনিয়ম*

- ভবন নির্মাণ কোড এবং অগ্নি নিরাপত্তা কোড না মেনে ভবন তৈরি এবং অনেক ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এমন ভবনে কারখানা স্থাপন (যেমন– আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে) করা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ি একই বা কাছাকাছি জায়গায় তৈরি করা হয়, যা বিকল্প সিঁড়ির কার্যকারিতা লোপ করে এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে; যেমন– তাজরীন ফ্যাশনসের দুর্ঘটনা।
- অনেক কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে কর্মপরিবেশ এবং কাঠামো থাকা দরকার তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কারখানাগুলোতে সাধারণত অপর্যাপ্ত পরিসর, তুলা জাতীয় ধুলা ব্যবস্থাপনার অভাব ও নিয়ন আলোর তাপ শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটায়। এ ছাড়া বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যানটিন এবং অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা অভাব, চলাচলের জায়গা ও বর্জ্য পরিশোধনাগারের অভাব বা অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.১.২ *সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অনিয়ম*

- তথ্যদাতাদের মতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র ও মজুরি প্রদানের রসিদ শ্রমিকের হাতে দেওয়া হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বায়ারদের দেখানোর জন্য অধিক মজুরি দেখিয়ে শ্রমিকদের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হলেও মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মজুরি দেওয়া হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যেকোনো সময় বরখাস্ত করার সুবিধার্থে নিয়োগপত্র ও চাকরি থেকে অব্যাহতিপত্রে একই সাথে স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়।
- মজুরি নির্ধারণে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি ৩৭ দশমিক ৫ ডলার [যা ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও চীনে যথাক্রমে ১১৮, ৮০, ১১৩ ও ২২৮ ডলার]।
- কিশোর শ্রমিকদের (১৪-১৮ বছর) ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ও কর্মঘণ্টা (পাঁচ ঘণ্টা) মেনে চলা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কারখানার নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা ১০-১২ বছর বয়সের শিশুদের ১৪-১৮ বছর বয়সসীমার মধ্যে দেখিয়ে সনদ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।

- প্রসবকালীন সুবিধা না দেওয়ার জন্য মালিকদের মধ্যে গর্ভবতী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে আইনগত সুবিধা দেওয়া হয় না।
- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী দৈনিক অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়, কিন্তু বায়ার নিরীক্ষণে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার হিসাব লুকানো হয়। অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার মজুরি মাসিক বেতনের সাথে না দিয়ে দেরিতে দেওয়া হয় ও কম দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী ন্যূনতম ১০০ জন শ্রমিক থাকলে কারখানায় গ্রুপ বিমা করা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক কারখানায় শ্রমিকের গ্রুপ বিমা থাকে না।

৩.১.৩ *শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ না করা*

- মালিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার নেটওয়ার্কের (ঝুট ব্যবসা, পরিবহন ও খাদ্য সরবরাহের ঠিকাদারি) মাধ্যমে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- অর্থের বিনিময়ে পুলিশ বা শিল্প পুলিশকে মালিকের স্বার্থে ও শ্রমিক আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা হয়।
- ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। মালিক কর্তৃক মামলা ও হয়রানির (চাকরিচ্যুতি, কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া, মাস্তান কর্তৃক মারধর, ছুটি না দেওয়া ইত্যাদি) মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং শ্রম পরিদর্শক ও মালিকের সমঝোতায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন কার্যক্রম ব্যাহত করা হয়।
- মালিক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপরন্তু এ কমিটি বিধিসম্মতভাবে গঠিত হয় না এবং শ্রমিকদের কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয় না।
- কারখানার মালিক ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পরিদর্শন কাজ ব্যাহত করা হয়।

৩.২ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

তৈরি পোশাক কারখানার মালিক সংগঠন বিজিএমইএর মূল ভূমিকা হচ্ছে সদস্য কারখানার মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ ও আইনানুগ অধিকার রক্ষা, নতুন বাজার সৃষ্টি ও বিদ্যমান বাজারে ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়িক মিশন পরিচালনা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন, সোশ্যাল ও টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। মালিক সংগঠন কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- বিজিএমইএ নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ না হয়েও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে; যেমন– ইউডি ছাড়পত্র প্রদান। বিজিএমইএর অনুমোদন ছাড়া পোশাক রপ্তানি ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায় না।
- বিভিন্ন নীতিমালার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নামসর্বস্ব আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়; যার স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

- বিজিএমইএ কর্তৃক নামসর্বস্ব অগ্নিনিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট নয়; যেমন– বিজিএমইএ স্বীকৃত ৩৪টি কারখানায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী টাস্কফোর্স কর্তৃক পুনর্নিরীক্ষণে কমপ্লায়েন্স পাওয়া যায়নি।
- দাতা কর্তৃক বিজিএমইএকে প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম লক্ষ করা যায়; যেমন– বিজিএমইএ কর্তৃক পরিচালিত ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।
- তাজরীন ফ্যাশনস ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে বায়ার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।
- লেবার আরবিট্রেশন সেল শ্রমিকবান্ধব নয় এবং মধ্যস্থতায় বিজিএমইএর কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মালিক পক্ষের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিএমইএর পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক অভিযুক্ত কারখানার মালিকদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। যেমন– তাজরীন ফ্যাশনসের মালিককে বিজিএমইএ ভবনে আশ্রয় দেওয়া হয়।
- নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে বিজিএমইএর রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। বর্তমান সংসদের সদস্যদের ১০ শতাংশ তৈরি পোশাকশিল্পে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত; পরোক্ষভাবে রাজনীতিকদের পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের অনেকেই তৈরি পোশাক ব্যবসায় জড়িত। এসব সদস্যের অনেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে (বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট) সদস্য হওয়ার কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং অনেক ইতিবাচক সংস্কারে বাধা বা দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে 'বস্ত্র ও পোশাকশিল্প বোর্ড বিল' আইনে পরিণত না করা, 'অ্যাপারেল বোর্ড' গঠন না করা, মালিকদের চাপে উৎসে করের হার ১ দশমিক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৮০ শতাংশ করা, আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিস্টের মাধ্যমে প্রভাবিত করা, বাস্তবে রেশনব্যবস্থা কার্যকর না থাকলেও সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে রেশনব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে- ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ ভবন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। উচ্চ আদালত পাঁচটি কারণে বিজিএমইএ ভবনকে অবৈধ ঘোষণা ও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

৩.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

তৈরি পোশাক খাতে এ প্রতিষ্ঠান কারখানা রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র প্রদান ও নবায়ন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন; শ্রমিকদের নিয়োগ-সংক্রান্ত শর্তাবলি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, শ্রমকল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় পরিদর্শন; আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরূপ :

- বিকাশমান শিল্পায়ন তদারকিতে পরিদপ্তরের অপর্যাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো, সক্ষমতার অভাব ও অপর্যাপ্ত পরিদর্শকের কারণে প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন পরিদর্শকের মধ্যে ৫৬ জন কর্মরত রয়েছেন।
- তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া নিজস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতির কারণে কারখানার সংখ্যা, ধরন, অবস্থান ইত্যাদি কোনো তথ্য প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষিত নেই।
- কারখানা নিবন্ধন, নবায়ন ও ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদানে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ এবং পরিদর্শক কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন না করে অফিসে বসেই নিবন্ধন ও নবায়ন সনদ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।
- শ্রমিকের মজুরি, ছুটি, কর্মঘণ্টা ও কর্মপরিবেশ ইত্যাদি বিষয় পরিদর্শক কর্তৃক নিয়মমাফিক পরিদর্শন করা হয় না এবং কারখানা পরিদর্শনকালে অর্থের বিনিময়ে কারখানার বিভিন্ন রেজিস্টার খাতা (১২টি) নিরীক্ষা করা হয় না।
- মালিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। দাখিলকৃত মামলায় অভিযোগ প্রমাণে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে পরিদপ্তরের ব্যর্থতা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

৩.৪ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রাজউকভুক্ত ভূমি ব্যবহার অনুমোদন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতে রাজউক ভূমিকা পালন করে। এতে বিদ্যমান নিম্নলিখিত সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি তৈরি পোশাক খাতের সাথে সম্পর্কিত।

- রাজউক কর্তৃক ভূমি ব্যবহার অনুমোদন-প্রক্রিয়া জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও ঝামেলাপূর্ণ হওয়ার ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্যাকেজে কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ২০-৩০ হাজার টাকা প্যাকেজে রাজউক-সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা যায় বলে তথ্য পাওয়া যায়।
- কারখানার নির্মাণ নকশা অনুমোদনে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবিরের প্রয়োজন হয়। একটি নকশা অনুমোদনে আটটি পর্যায়ে গড়ে সর্বনিম্ন এক লাখ ২৪ হাজার থেকে তিন লাখ ৫৪ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণস্থল পরিদর্শন না করে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে তদারকির কার্যসম্পন্ন করা হয়।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' ও 'ব্যবহার সনদ' প্রদানে গাফিলতি, বিভিন্ন সেবা প্রদানে হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলের ওপর আপত্তি জারি ইত্যাদি অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

তৈরি পোশাক খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান; ভূমি ব্যবহার অনুমোদন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন ও নির্মাণমান নিশ্চিত করা। এ খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন নিম্নরূপ :

- নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। পৌরসভা আইনে ভবন নির্মাণের অনুমোদনের ক্ষমতা পৌরসভাকে প্রদান করা হলেও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন না থাকলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তাজরীন ফ্যাশনস ইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অনুমতি নিয়ে তৈরি।
- কারখানা নির্মাণ ছাড়পত্র প্রদানে চেয়ারম্যান, মেয়র বা ওয়ার্ড কমিশনারদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। ছাড়পত্র প্রদানে গড়ে প্রায় দুই থেকে তিন লাখ টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া তদারকি ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি এবং মালিকপক্ষের প্রভাবে অনেক বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শৈথিল্য প্রদর্শন করে।

৩.৬ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তৈরি পোশাক খাতে অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদান, কারখানায় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও তদারকি করা এবং প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরূপ :

- ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্সের পর্যাপ্ত জনবল (ঢাকা বিভাগে ১৫ জন পরিদর্শক) ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নিনির্বাপণ আইনে 'উঁচু ভবন'-এর সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উঁচু ভবন নির্মাণে ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স থেকে সনদ গ্রহণ করা হয় না এবং এ ক্ষেত্রে ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়।
- ত্রুটিপূর্ণ ভবনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদান করা হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স পরিচালিত এক গবেষণা অনুযায়ী ২৩ দশমিক ২৮ শতাংশ পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফায়ার ব্রিগেড কর্মকর্তাদের পছন্দনীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে অগ্নিনিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বাধ্য করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে পরিদর্শনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা জলাধার না থাকা, টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, শ্রমিক অনুপাতে নির্গমন দরজা না থাকা, নির্গমন দরজা সঠিক স্থানে না থাকা ইত্যাদি অনিয়মের ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে ছাড় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩.৭ শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) ও শ্রম পরিদপ্তর

তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; অধিকার বিষয়ে সচেতন করা; যৌথ দর-কষাকষি ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করা; এবং এ খাতের উন্নয়নে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক উৎসাহিত করা শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের দায়িত্ব শ্রম পরিদপ্তরের। তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক সংগঠন-সংক্রান্ত সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন নিম্নরূপ :

- তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে ১৫৭টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৪০-৫০টি সক্রিয় রয়েছে।
- ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আইনি জটিলতা বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন করা হয়।
- শ্রমিক অধিকার-সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ও ধারাবাহিক কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা অর্থের বিনিময়ে মালিকের স্বার্থে কাজ করেন।
- ট্রেড ইউনিয়নে জাতীয় দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনিবন্ধিত ফেডারেশনের কার্যক্রমের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফেডারেশনের কার্যাবলি সম্পর্কে কোনো আইনগত দিকনির্দেশনা বা বিধিমালা নেই এবং নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম প্রাধান্য পায়। অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও ফেডারেশনভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয় না। কারখানা পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ্য, তথ্যদাতাদের মতে, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির কাছে (৪০-৫০ জন) কুক্ষিগত।
- তৈরি পোশাক খাতে অধিকাংশ শ্রমিক নারী হওয়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নে তাদের অংশগ্রহণ কম।
- ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।
- ফেডারেশন কর্তৃক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বাবদ আইএনজিও থেকে প্রাপ্ত অনুদান অনেক ক্ষেত্রে ফেডারেশনের নেতৃত্বে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩.৮ বায়ার

তৈরি পোশাকশিল্পে বায়ার বলতে সব বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়, চূড়ান্ত ভোক্তাকে বোঝানো হয় না। সাধারণত বায়ারদের এ বাণিজ্যে সর্বেসর্বা বলা হয়। পণ্যের গুণগত মান, কারখানার সঠিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করে কারখানায় উৎপাদন আদেশ প্রদানে বায়ারদের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে। এ ক্ষেত্রে বায়ারদের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরূপ।

- শ্রম অধিকার ও কর্মপরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভালো পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ বেশি থাকে। এ কারণে মালিক ‘কমপ্লায়েন্ট কারখানা’ দেখিয়ে রপ্তানির চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে।

- উৎপাদন চাহিদা মেটানোর জন্য নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন করলেও অনেক বায়ার আপত্তি তোলে না বা এড়িয়ে যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশের শর্তাবলি পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স অডিটর ও মালিকদের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার প্রকৃত চিত্র গোপন করা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স অডিটরদের সন্তুষ্টির জন্য বায়ার প্রতিনিধির জ্ঞাতসারে মালিক কর্তৃক কৃত্রিম কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।
- বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কারখানায় অর্ডার না দিয়ে কমিশন বা অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া হয়।
- একই কারখানায় বিভিন্ন বায়ার কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট প্রয়োগ করা হয়, যা কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে একধরনের বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বা বায়ার প্রতিনিধি পণ্যের আদেশ প্রদানের সময় পণ্য-মূল্যের সাথে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে এবং তা নগদে মালিকপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। অপরদিকে উৎপাদনকালীন বায়ার প্রতিনিধি (কমপ্লায়েন্স ও মান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা) মালিক পক্ষের কাছ থেকে আদেশ বাতিলের ভীতি প্রদর্শন করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ পরিশোধে গড়িমসি করে অথবা ঠিকমতো পরিশোধ করে না।

৪. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি কারণ হচ্ছে– এ খাতের জন্য লিড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও তদারকির সক্ষমতা ঘাটতি, বিচার-প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, মালিক ও বায়ারদের অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার প্রবণতা, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে মালিকদের অবহেলা ও প্রায়োগিক দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত মজুরিকাঠামো ও অন্যান্য আইনানুগ আর্থিক সুবিধা না দেওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব, বিজিএমইএর কার্যকর ভূমিকা ও জবাবদিহির অভাব এবং সর্বোপরি নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যবসা ও রাজনীতির প্রভাব এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এসব কারণের ফলে তৈরি পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্স-ঘাটতি, অগ্নিদুর্ঘটনা, ভবন ধস, আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, মালিক-শ্রমিক আস্থার সংকট, আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম-দুর্নীতির সংমিশ্রণ এবং কার্যকর শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর প্রভাবে এ খাতে শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ববরণ এবং জীবনযাত্রার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়, ব্র্যান্ড সুনাম ক্ষুণ্ন ও রপ্তানি হ্রাস এবং জিএসপি-সুবিধা বাতিল ও বাতিলের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট সম্পূরক শিল্পে গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং সর্বোপরি উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১ : তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ → **ফলাফল** → **প্রভাব**

কারণ

- লিড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা
- তদারকি সংস্থার সক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিমালার প্রয়োগের ঘাটতি
- শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার-প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা
- কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে মালিকদের প্রায়োগিক দুর্বলতা
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব
- কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে মালিকদের প্রায়োগিক দুর্বলতা
- অপর্যাপ্ত মজুরিকাঠামো
- মালিক ও বায়ারদের অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার প্রবণতা
- নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যবসা ও রাজনীতির প্রভাব এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব
- বিজিএমইএর কার্যকর ভূমিকা ও জবাবদিহির অভাব

ফলাফল

- কমপ্লায়েন্স ঘাটতি
- অগ্নি দুর্ঘটনা, ভবন ধস
- আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন
- শ্রমিকদের কার্যকর সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দর-কষাকষির সক্ষমতার অভাব
- মালিক- শ্রমিক সম্পর্কে আস্থার সংকট
- আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম-দুর্নীতির সংমিশ্রণ
- মালিক পক্ষের নীতি সুবিধা আদায়
- বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারে স্বচ্ছতার অভাব

প্রভাব

- শ্রমিকের মৃত্যু, পঙ্গুত্ববরণ ও জীবনযাত্রার মানে নেতিবাচক প্রভাব
- তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতা (শ্রমিকদের মধ্যে নিরাপত্তা আতঙ্ক, শ্রমিক অসন্তোষ, কারখানা ভাঙচুর)
- অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- ব্র্যান্ড সুনাম ক্ষুণ্ণ ও রপ্তানি হ্রাস, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পূরক শিল্পে গতিশীলতা হ্রাস
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব
- জিএসপি-সুবিধা বাতিল ও বাতিলের ঝুঁকি সৃষ্টি
- উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা তৈরি করে এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, সর্বোপরি যা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানোর দীর্ঘমেয়াদি ফাঁদ তৈরি করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ফলে, এ খাতের অস্থিতিশীলতা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়; বরং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি ও সর্বোপরি এ শিল্পের সুশাসনের ব্যর্থতার ফলাফল। এসব অনিয়ম ও সমস্যা থেকে উত্তরণে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণে তৈরি পোশাক খাতের সমস্যা থেকে উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

৫.১ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

১. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তদারকি তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারখানা পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের জন্য একটি অধিদপ্তর গঠন করতে হবে।

২. আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং 'শ্রম বিধিমালা' প্রণয়নে তৈরি পোশাক খাতের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার জন্য শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৪. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অগ্নি বা ভবন ধস-সংক্রান্ত মামলা শ্রম আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করার বিধান করতে হবে।

৬. পোশাক কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও জনবলসহ অগ্নিনির্বাপক স্টেশন স্থাপন এবং পোশাক খাতের জন্য বিশেষায়িত অগ্নিনিরাপত্তা পরিদর্শক সেল গঠন করতে হবে।

৭. প্রতি কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলির 'বিধিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক কারখানার মালিকরা তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে যেন সদস্য হতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের জন্য সরকার প্রতিশ্রুত পোশাকশিল্প পল্লিতে কারখানা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে এবং একাধিক পোশাকপল্লি স্থাপন করতে হবে।

১০. শ্রম আইনের ২৩২ (৩) ধারা অনুসারে তৈরি পোশাক খাতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনে প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার পরিবর্তে রপ্তানিকৃত পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১ দশমিক ৫ সেন্ট কল্যাণ তহবিলে প্রদান করতে হবে; এ ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে বায়ার-মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫ এবং তহবিল পরিচালনা বোর্ডে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ অংশীজন প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত সুপারিশ

১১. তদারকি সংস্থাগুলোর দক্ষতা, জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

১৩. রাজউকসহ অন্যান্য নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ ও নকশা অনুমোদন-সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিত করতে হবে এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয়

সরকার প্রতিষ্ঠানকে জেলা গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ-সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস ও রাজউককে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৫. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়ায় কত সময় লেগেছে, নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে কি না, না দিলে কেন দেওয়া হলো না– তা শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনকে রাজনৈতিক দল ও বিজিএমইএর সম্পৃক্ততা ত্যাগ করে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং নেতৃত্ব আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত করতে হবে।

১৭. প্রতিটি তৈরি পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স, অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিদর্শনের তথ্য নিয়ে একটি প্রকাশ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। কারখানাগুলোর যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে এবং এজন্য যে শাস্তি সুপারিশ করা হয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নামসহ তথ্যভান্ডারে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. পোশাক কারখানার সব পর্যায়ের শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণে সরকার, বিজিএমইএ এবং বায়ারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. শ্রমিকদের জন্য জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ অগ্নিনিরোধক পরিচয়পত্র প্রদান এবং হাজিরা খাতার নিরাপদ সংরক্ষণ করতে হবে।

২০. তৈরি পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশের জন্য একটি একক আচরণ বিধিমালা (Uniform Code of Conduct) প্রণয়ন করতে হবে।

২১. সব কারখানায় 'জেন্ডার কোড অব কনডাক্ট' নিশ্চিত করতে হবে।

২২. কারখানার সঠিক কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেই অনুসারে বায়ারদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. তৈরি পোশাক কারখানায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে সরকারের ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও তা ব্যয়ের তথ্য এবং দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

২৪. রানা প্লাজা-পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ ও অধিকার-সংক্রান্ত গৃহীত উদ্যোগ ও সহায়তা কর্মসূচি একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় নিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বয় ও বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২৫. তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগে নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্টতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি*

ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী ও নাজমুল হুদা মিনা

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় থেকে জোরালো চাপ সৃষ্টি হয়। টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপরিউক্ত গবেষণায় ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। রানা প্লাজার দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পর্যায়ে এ খাতের উন্নয়ন, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি কর্তৃক বর্তমানে ফলোআপ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। টিআইবি পরিচালিত পূর্ববর্তী গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী বিগত এক বছরে (এপ্রিল, ২০১৩ হতে এপ্রিল, ২০১৪) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেক লিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কাছ থেকে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি মার্চ-এপ্রিল, ২০১৪ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

বিগত এক বছরে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর মধ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন; খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের মধ্যে বিদ্যমান অসমাঞ্জস্যতা চিহ্নিতকরণে টাস্কফোর্স গঠন; ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক পোশাক

---

* ২০১৪ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ। এটি টিআইবি কর্তৃক (অক্টোবর, ২০১৩) প্রকাশিত 'তৈরি পোশাক খাত : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ফলোআপ।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি (সর্বনিম্ন গ্রেডে মোট মজুরি ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি), ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন না দেওয়ার জন্য পরিপত্র জারি ইত্যাদি। এ ছাড়া শ্রম নীতিমালা এবং বিভিন্ন পরিদর্শন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতের জন্য গৃহীত এ সকল কার্মকাণ্ডের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকির জন্য মন্ত্রিপরিষদ ও সচিব কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার প্রশাসনিক বিভিন্ন অনিয়ম, সমস্যা ও সক্ষমতার ঘাটতি দূরীকরণে বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেমন- রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আঞ্চলিক অফিসে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং রাজউক কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন ও আবেদনপ্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। একই সাথে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মুক্তকরণ ও প্রকাশ্য তথ্যভান্ডার গঠন, কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও নবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আবেদন অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অপরদিকে, সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অগ্নিনিরাপত্তা সনদ ও নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে একটি ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র গঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় মালিক, শ্রমিক ও সরকারের সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতে অগ্নিনিরাপত্তা ও কাঠামোগত সংহতির জন্য জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিএ) প্রণয়ন এবং সাসটেইনেবিলিটি কম্প্যাক্ট স্বাক্ষর, এনটিপিএর আওতায় অগ্নি, বৈদ্যতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য অভিন্ন চেকলিস্ট প্রণীত হয়েছে। ইউরোপিয়ান বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) ও আমেরিকান বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জরিপ কার্য চলমান রয়েছে এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ‘রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে। সর্বোপরি কর্মনিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে মালিকের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ত্রিপক্ষীয় কর্মকৌশলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা এখনো লক্ষ করা যায়। অপরদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে অস্পষ্টতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

গত এক বছরে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক চিত্র

টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৩ সালের গবেষণায় চিহ্নিত সমস্যার আলোকে ৬৩টি বিষয়ে বিভিন্ন অংশীজনের উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৫৪টি বিষয়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বৃহৎ পরিসরে ১০২টি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং ৯টি বিষয়ে কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত না নেওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- পোশাক খাতের জন্য লিড মিনিস্ট্রি স্থাপন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলি সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও পোশাক খাতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন বিষয় উল্লেখযোগ্য।

৫৪টি বিষয়ে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৩১ শতাংশ উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৬০ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রগতি হয়েছে– যা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এবং ৯ শতাংশ উদ্যোগে কেনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। (বিস্তারিত সংযুক্ত)

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

পূর্ববর্তী গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের সূচক গুলো (স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা ও আইনের শাসন) ভিত্তি ধরে গৃহীত ও চলমান কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান–

সরকার ও সরকারি সংস্থা

কমপ্লায়েন্স ঘাটতি ও অগ্নিদুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, বিচার না হওয়া ইত্যাদি এ খাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত (টিআইবি, অক্টোবর, ২০১৩)। রানা প্লাজা পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায় থেকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির কারণে এ খাতে আইনি শাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ করা যায- ভবন ধস বা কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে কারখানার মালিককে আইনের আওতায় আনা, অভিযুক্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা সেল গঠন এবং অভিযুক্ত কারখানার বিরুদ্ধে জরিমানা ও মামলা প্রদান (কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০ মামলা বিচারাধীন) ইত্যাদি। কিন্তু রানা প্লাজা-সংক্রান্ত মামলাগুলোর অভিযোগপত্র না দেওয়া, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা, মামলা পরিচালনায় মালিক পক্ষের সাথে আইনি সহায়তা সেলের আইনজীবীদের যোগসাজশ এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতা– এ বিষয়গুলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক প্রভাবক হিসেবে এখনো বিদ্যমান।

আবার, অংশীজন কর্তৃক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পর্যায় বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে কলকারখানা, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক নিয়োগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়নি। এনটিপিএ, অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ডের শর্তানুযায়ী স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাঝুঁকি ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমবিষয়ক ‘হট লাইন’ স্থাপনের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়নি; তেমনি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা পোশাক কারখানা পোশাকপল্লিতে স্থানান্তরে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। নিবন্ধন ও সনদ প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়নে অনলাইনের ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ এখনো বিদ্যমান।

কারখানার মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

কারখানার মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, মালিক কর্তৃক অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে প্রদান, হাজিরা খাতা ও বেতনশিট নিয়মিত বিজিএমইএতে পাঠানো, শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও বেতন

রসিদ প্রদানের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো কারখানায় ৩ থেকে ৪ মাস পর নিয়োগ পত্র প্রদান এবং বেতন প্রদানের সাথে সাথে রসিদ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কোনো কোনো মালিক কর্তৃক কারখানার প্রকৃত শ্রমিক কম দেখিয়ে গ্রুপ বিমা করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। মালিক কর্তৃক কারখানা পর্যায়ে ৮০-৯০ শতাংশ কারখনায় মজুরি বোর্ড নির্ধারিত হারে বেতন প্রদান করা হলেও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ায় শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি, হেলপার পদে আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও যৌথ দর-কষাকষির বিষয়ে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা কিংবা চাকরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। মালিক পর্যায়ে আইনানুযায়ী কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগে গাফিলতি এবং শ্রমিক অধিকার প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়।

বিজিএমইএ কর্তৃক সদস্য কারখানাগুলোর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- গ্রুপ বিমা করা, কারখানার নিচতলায় জেনারেটর স্থাপন, মৃত্তিকা প্রতিবেদন সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে স্বচ্ছতা আনয়নে বিজিএমইএ কর্তৃক প্রতিশ্রুত শ্রমিকদের সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতের কার্যক্রমে অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না।

শ্রমিক সংগঠন

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত এক বছরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু 'ল্যাপটপ ট্রেড ইউনিয়ন' নামে নতুন এক ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম লক্ষ করা যায়, যাদের কারখানা বা মাঠপর্যায়ে বাস্তবভিত্তিক কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না। আবার অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধা, জমি, ফ্ল্যাট কিংবা বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে চাঁদা আদায় ও প্রতারণা কার্য পরিলক্ষিত হয়।

বায়ার

বায়ার এ খাতের অন্যতম অংশীজন, কিন্তু বায়ার কর্তৃক কারখানার নিরীক্ষা প্রতিবেদন মালিক ও সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে ইন্টারনেটে প্রকাশ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রকৃত তথ্য লুকিয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করা এবং বিশেষ করে কমপ্লায়েন্স ঘাটতির যুক্তিতে বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিল ও অন্য বায়ারকে অর্ডার বাতিলে প্রলুব্ধ করার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। বায়ারের এ ভূমিকায় চূড়ান্তভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন তথ্য মতে বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিল, কমপ্লায়েন্স যুক্তিতে মাঝারি ও ক্ষুদ্র কারখানা বন্ধ কিংবা মালিক কর্তৃক শ্রমিক ছাঁটাইয়ে প্রায় ২০ থেকে ৫০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছে। আশঙ্কা করা হয় এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতে কর্মরত আরও অনেক শ্রমিকের বেকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। বায়ারের সংবেদনশীল অচরণ নিশ্চিত করা না গেলে শ্রমিক চাকরিচ্যুত ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে ব্যবসায়িক নৈতিকতার ভিত্তিতে শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বায়ারের এখতিয়ারভুক্ত দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, রানা প্লাজায় অবস্থিত পাঁচটি কারখানায় কমপক্ষে ২৮টি বায়ার পণ্য উৎপাদনে জড়িত ছিল, কিন্তু অল্প সংখ্যক বায়ার ব্যতীত বেশির ভাগ বায়ারের এ দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবনতা লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে, বায়ার জোট কর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা জরিপ কার্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরণে ধীরগতি লক্ষণীয়। এখন পর্যন্ত অ্যাকর্ড কর্তৃক ১ হাজার ৬২৬টির মধ্যে ৮০টি, অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৬২৬টির মধ্যে ২৪৭টি এবং বুয়েট কতৃক প্রায় দুই হাজার কারখানার মধ্যে ২৪৭টি কারখানার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।[১] দৃশ্যমান এ জরিপ কার্যের ধীরগতি বিস্তারিত টেকনিক্যাল জরিপ কার্যকে যেমন কালক্ষেপণ করবে তেমনি পোশাক খাতে টেকসই কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদে চলমান কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। অ্যাকর্ডের শর্তানুসারে ছয় সপ্তাহের মধ্যে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে না এবং অ্যালায়েন্স কর্তৃক কারখানা পরিদর্শনের রিপোর্ট প্রকাশে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় (শুধু ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার রিপোর্ট প্রকাশের বিধান রয়েছে) জরিপ প্রতিবেদনের স্বচ্ছতার ঝুঁকি রয়েছে। জরিপ চলাকালীন কারখানার সংস্কার কাজে কারখানা বন্ধ রাখা হলে শ্রমিকের বেতন ধারাবাহিকভাবে প্রদানে বায়ারের চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার (অ্যাকর্ডের ক্ষেত্রে) রয়েছে, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মালিক-বায়ারের মধ্যে সমঝোতার অভাব লক্ষ করা যায়। আবার চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে প্রথম দু-বছর) কারখানায় অর্ডার প্রদান অব্যাহত রাখার বিধান থাকলেও কোনো কোনো ব্র্যান্ড ও বায়ার কর্তৃক অর্ডার কমিয়ে ফেলা বা অর্ডার না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

অংশীদারি ভবনে গড়ে ওঠা কারখানা সংস্কারে রেমিডিয়েশন ফান্ড প্রদানে মালিক-বায়ার দ্বন্দ্ব এবং সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান এরকম শেয়ার বিল্ডিং গড়ে ওঠা ১৫ শতাংশ কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও ভবন নিরাপত্তা প্রশ্নে কারখানা বন্ধ হলে কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমিক। এ জন্য শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে এরকম কারখানার জন্য বায়ারের যৌক্তিক স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরদিকে এখন পর্যন্ত রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মালিক, সরকার ও বায়ার (প্রাইমার্ক ব্যতীত) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানে অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত খরচ ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। আগে বায়াররা অতিমুনাফার উদ্দেশ্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদান করত এবং দুর্ঘটনা হলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো (টিআইবি, ২০১৩), বর্তমানে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তার অজুহাতে ওইসব নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানাকে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য সহযোগিতা না করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় চূড়ান্তভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে– অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স খারাপ অবস্থায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠার যুক্তিতেও শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইউরোপিয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিছপ্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট উৎপাদন খরচ প্রদান করা হলে কারখানা পর্যায়ের কমপ্লায়েন্সের এ বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ও টেকসই করার জন্য বায়ার বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

[১] www.mole.gov.bd, accessed on 31 March, 2014

উপসংহার ও সুপারিশ

পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নে ও শ্রমিক কল্যাণে বায়ার ফোরাম ও মালিক কর্তৃক কোনো তহবিল গঠনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কারখানার মালিক অংশগ্রহণ করে না আবার বায়ার কর্তৃকও কোনো ফান্ড গঠন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ডে বায়ারের দান হচ্ছে ঐচ্ছিক, এটি কোনো ক্ষতিপূরণ নয় এবং খাতসংশ্লিষ্ট কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নয়। কার্যত শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতে মালিক ও বায়ারের সংবেদনশীল ভূমিকার অভাব এখনো বিদ্যমান। এ পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবির (অক্টোবর, ২০১৩) সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১ দশমিক ৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার-মালিক অনুপাত হবে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। রানা প্লাজা পরবর্তী তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগগুলো বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনে সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য এ পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য 'তৈরি পোশাক খাত সুশাসন কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে। এ কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য থাকবে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় করা এবং অংশীজনের সুশাসন বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা তদারকি করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

শ্রমিক অধিকার এবং কমপ্লায়েন্স ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যেমন কেনো বিকল্প নেই, তেমনি শ্রমিকের চাকরির নিশ্চয়তা ও শিল্পকে চলমান রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্ডার বাতিল, কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে বায়ার, মালিক ও সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে শিল্পের টেকসই উন্নয়নে পোশাকপল্লিতে কারখানা স্থানান্তর কার্যকে বেগবান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের গৃহীত ও প্রতিশ্রুত উদ্যোগসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল হতে হবে। সর্বোপরি রানা প্লাজাপরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গত এক বছরে অগ্নি, কাঠামোগত নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছে বা বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে, যা বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ অংশীজনের ইতিবাচক প্রচেষ্টার প্রক্ষেপণ প্রমাণ করে।

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসনকেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল ২০১৩ - এপ্রিল ২০১৪)

১.১ সরকারি উদ্যোগ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১.	বাংলাদেশ শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা	• আইএলও কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইনের সংশোধন করা • কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার বিধান করা	১. বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাস	সম্পন্ন	পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, পরিদর্শকদের জবাবদিহির উল্লেখ না থাকা, অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে অসামঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এখনো বিদ্যমান
২.	স্বাস্থ্য ও পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ে আইনে অস্পষ্টতা	• আইনে অস্পষ্টতা দূর করা	২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ জাতীয় নীতি ২০১৩ প্রণয়ন	সম্পন্ন	এ নীতি সম্পর্কে অনেক মালিক অবগত নন
৩.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নিনির্বাপণ আইনে অসামঞ্জস্য	• খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা	৩. খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময় ছিল -৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩
৪.	তৈরি পোশাক খাতের শ্রম বিধিমালার অনুপস্থিতি	• 'শ্রম বিধিমালা' প্রণয়নে তৈরি পোশাক খাতের বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ	৪. তৈরি পোশাক খাতের জন্য শ্রম বিধিমালা প্রণয়নাধীন	অগ্রগতি হয়েছে	চূড়ান্তকরণে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নেই
৫.	সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নীতিমালা না থাকা	• নীতিমালা প্রণয়ন করা	৫. সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য গাইডলাইন প্রণয়নাধীন	অগ্রগতি হয়েছে	চূড়ান্তকরণে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নেই
৬.	লিড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি	• পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা	**কোনো উদ্যোগ নেই**		অপরিবর্তিত
৭.	সরকারি বিভিন্ন (১৭টি) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২০টি সনদ/নিবন্ধন গ্রহণে জটিলতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	• নিরাপত্তা, কর্ম-পরিবেশ ও অধিকার সংক্রান্ত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা • সমন্বয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা • মন্ত্রণালয় গঠন না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন ওয়ান স্টপ সেল গঠন	৬. জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মকৌশল (এনটিপিএ) বর্ধিতকরণ* ৭. সাসটেইন-ইবিলিটি কম্প্যাক্ট স্বাক্ষর ৮. পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ৯. তদারকির জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ কমিটি ১০. তিন সদস্যবিশিষ্ট সচিব কমিটি ও একাধিক টাস্কফোর্স গঠন ১১. এনটিপিএর আওতায় অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য অভিন্ন চেকলিস্ট প্রণয়ন	সম্পন্ন	এনটিপিএর আওতায় পোশাক খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আইনি বিষয় সম্পন্ন হলেও প্রায়োগিক কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
			১২. কারখানা নিবন্ধন, অগ্নি, বৈদ্যুতিক, কেমিক্যাল ও পরিবেশ সনদ প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধনে টাস্কফোর্স গঠন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময় ছিল - ৩১ ডিসেম্বর, ১৩
			১৩. তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময় ছিল - ৩০ মে, ২০১৩
৮.	কম মজুরি (ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা)	• মজুরি বৃদ্ধি করা	১৪. ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি	অগ্রগতি হয়েছে	আনুপাতিক হারে মূল বেতন বৃদ্ধি পায়নি
৯.	অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ (মৃত্যু- ১ লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে ১.২৫ লাখ)	• দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা	১৫. ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন	অগ্রগতি হয়েছে	আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি
১০.	• বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি • শ্রমিকদের মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তার জন্য সরকারি আইনজীবী না থাকা	• শ্রম আদালতে মামলা নির্দিষ্ট সময়ের (৯০ দিন) মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করা • কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা	১৬. আইনগত সহায়তা সেল গঠন ১৭. কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক আইনজীবী প্যানেল নিয়োগের উদ্যোগ	সম্পন্ন	• সরকার/এনজিও নিযুক্ত আইনজীবীদের মালিক পক্ষের সাথে যোগসাজশ • প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের বৃহৎ অংশ আইনজীবী ও শ্রমিক সংগঠনের ফি বাবদ ব্যয়
			১৮. কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের ১৯. কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে ১১টি মামলা দায়ের ২০. রাজউক কর্তৃক সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ২১. ভবন মালিক, কারখানার মালিক ও অনুমোদনকারী প্রকৌশলী গ্রেপ্তার	অগ্রগতি হয়েছে	• রানা প্লাজার চারটি মামলার চার্জশিট প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা • আদালত কর্তৃক একটি মামলায় রানার জামিন লাভ (উচ্চ আদালতে স্থগিত) • স্মার্ট গার্মেন্টেসের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা আদালত কর্তৃক খারিজ
			২২. তাজরীন ফ্যাশনসের মামলার চার্জশিট প্রদান এবং চেয়ারম্যান ও পরিচালককে গ্রেপ্তার	অগ্রগতি হয়েছে	জামিন লাভ, পরে উচ্চ আদালত কর্তৃক জামিন বাতিল

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
			২৩. দুদক কর্তৃক মালিক এবং সাভার পৌরসভা ও রাজউকএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি নেই	তদন্ত কার্যের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি
১১.	বাসা-বাড়ি ও বাণিজ্যিক ভবনে অপরিকল্পিতভাবে পোশাক কারখানা স্থাপন	• একাধিক পোশাকশিল্প স্থাপন করা	২৪. মুন্সিগঞ্জে একটি পোশাক শিল্পপল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি হয়েছে	• ৫৩২ একর জমি অধিগ্রহণ ও আপত্তি কার্য চলমান, • বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক জটিলতা ও স্থবিরতা
১২.	দুর্ঘটনা-পরবর্তী গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য নিয়মিত প্রকাশ না করা	• সব কার্যক্রমের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা	২৫. সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে	সম্পন্ন	• অ্যাকর্ড কর্তৃক জরিপ বিষয়ক তথ্য নিয়মিত প্রকাশ না করা • অ্যালায়েন্স কর্তৃক জরিপ বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকা

১.২ মালিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১৩.	পরিচয়পত্রে জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর না থাকা	• যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ অগ্নি নিরোধক পরিচয়পত্র প্রদান	**কোনো উদ্যোগ নেই**		দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের পরিবারের সাথে যোগাযোগে ব্যর্থতা
১৪.	হাজিরা খাতা সংরক্ষণ না করা	• হাজিরা খাতা সংরক্ষণ করা	২৬. শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতনশিট বিজিএমইএতে নিয়মিত প্রদান	সম্পন্ন	দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের পরিবারের সাথে যোগাযোগে ব্যর্থতা
১৫.	ন্যূনতম মজুরি চেয়ে কম মজুরি প্রদান এবং সময়মতো মজুরি না দেওয়া	• মজুরি বৃদ্ধি করা	২৭. ৮০-৯০ শতাংশ কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি প্রদান	সম্পন্ন	• টার্গেট বৃদ্ধি • স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি • আইনানুগ সুবিধা ছাড়া চাকরিচ্যুতি
১৬.	দৈনিক অতিরিক্ত দুই ঘণ্টার বেশি (৫-৮ঘণ্টা) কাজ করানো অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে না দেওয়া	• আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান কার্যকর করা	২৮. অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন ২৯. অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা কাজ না করানোর প্রচেষ্টা ৩০. কারখানার অধিকাংশ শাখায় নিয়মমাফিক অতিরিক্ত দু'ঘন্টা কাজ করানো	সম্পন্ন	• কারখানার কিছু শাখায় (ফিনিশিং, বাটম ইত্যাদি) নিয়মের অতিরিক্ত সময় কাজ করানো • শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১৭.	অধিকাংশ কারখানায় গ্রুপ বিমা না থাকা	• আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কার্যকর করা	৩১. বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় গ্রুপ বিমা সম্পন্ন হয়েছে	সম্পন্ন	কারখানার কর্মরত শ্রমিক কম দেখিয়ে গ্রুপ বিমা করা
১৮.	কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এমন ভবনে (যেমন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন) কারখানা স্থাপন	• পরিকল্পিতভাবে পোশাকপল্লিতে কারখানা স্থানান্তর	৩২. সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ চলমান কিন্তু কারখানা স্থানান্তরে মালিক কর্তৃক সময়ক্ষেপণ ও অনীহা	অগ্রগতি হয়েছে	অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক এ ধরনের ভবন থেকে কারখানা সরানোর জন্য চাপ প্রয়োগ
১৯.	অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ির দুর্বল কাঠামো ও নির্ধারিত মান ও স্থানে না হওয়া বিদ্যুৎ সংযোগে অনিয়ম	• পর্যবেক্ষণ পূর্বক আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান কার্যকর করা	৩৩. কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য এনটিসির আওতায় অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও বুয়েট কর্তৃক জরিপ চলমান	অগ্রগতি হয়েছে	দুর্বল কাঠামো ও ঝুঁকিপূর্ণ সিঁড়ি এবং অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ সংযোগ এখনো বিদ্যমান এবং জরিপকার্যে ধীরগতি
২০.	বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র শ্রমিকের হাতে না দেওয়া মজুরি প্রদানের রসিদ না দেওয়া	• নিয়োগপত্র ও মজুরির রসিদ প্রদান	৩৪. নিয়োগপত্র ও মজুরির রসিদ প্রদানের প্রচলন শুরু হয়েছে	সম্পন্ন	• কাজে যোগদানের দিন নিয়োগপত্র না দিয়ে এক/ দুই মাসের বেতনের পর নিয়োগপত্র প্রদান • বেতন প্রদানের সাথে সাথে মজুরির রসিদ ছিঁড়ে ফেলা
২১.	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা না থাকা	• আইনানুযায়ী সুবিধাদি নিশ্চিত করা	৩৫. অধিকাংশ কারখানায় আইনের এ বিধান বাস্তবায়নের প্রচলন শুরু হয়েছে	অগ্রগতি হয়েছে	শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হলেও প্রতিকার পাচ্ছে না
২২.	ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী কমিটির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং ট্রেড ইউনিয়ন করতে নিরুৎসাহিত করা	• প্রতি কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বাধ্যতামূলক করা	৩৬. ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন	অগ্রগতি নেই	• সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে চাকরিচ্যুত করা • ইউনিয়ন/ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত শ্রমিকদের চিহ্নিত করে হয়রানি/মামলার ভয়/ চাকরিচ্যুত
২৩.	বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যানটিন, চিকিৎসা সুবিধা, পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা, চলাচলের জায়গা ও বর্জ্য পরিশোধনাগারের অভাব/ অনুপস্থিত	• আইনের বিধান কার্যকর করা	৩৭. এসব বিষয়ে বায়ার প্রতিনিধি ও পরিদর্শকদের পর্যবেক্ষণে ইতিবাচক অগ্রগতি	অগ্রগতি হয়েছে	• বিভিন্ন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত সাতটি দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য • সাব কন্ট্রাক্ট কারখানায় লক্ষণীয় কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না

১.৩ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
২৪.	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃত্ব চর্চা (ইউডি প্রদান)	• অন্যান্য শিল্প খাতের ন্যায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	অপরিবর্তিত
২৫.	সদস্য কারখানা কর্তৃক সিদ্ধান্ত আমলে না নেওয়া	• সিদ্ধান্ত আমলে না নিলে বিভিন্ন সেবা (যেমন-ইউডি) বন্ধ করে দেওয়া	৩৮. সব সদস্য কারখানার নিচতলা জেনারেটর স্থাপনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা ৩৯. সব সদস্য কারখানার মৃত্তিকা প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ ৪০. সদস্যভুক্ত কারখানায় শ্রমিকের গ্রুপ বিমা করার নির্দেশ	সম্পন্ন	• মৃত্তিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি • নির্দেশ অমান্যকারী কারখানাকে সেবা প্রদান বন্ধ (ইউডি বন্ধ)
২৬.	অগ্নি নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সমন্বিত অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ	• শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৪১. কারখানার মধ্যম সারির কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্রাস কোর্স চালু এবং এ লক্ষ্যে ৩৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ	অগ্রগতি হয়েছে	চলমান রয়েছে
২৭.	পোশাক খাতের শ্রমিকদের তথ্যভান্ডার না থাকা	• শ্রমিকদের তথ্যভান্ডার করা	৪২. বিজিএমইএ কর্তৃক তথ্যভান্ডার করার উদ্যোগ গ্রহণ	অগ্রগতি নেই	কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে
২৮.	নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব: (উৎসে করের হার ১.২০ শতাংশ কমিয়ে ০.৮০ শতাংশ করা, আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিইস্টের নিয়োগ)	• ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার না করা	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ২৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা উৎসে কর ০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩ শতাংশ নির্ধারণ এবং ৪৮. নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২ শতাংশ নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা
২৯.	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সদস্যপদ	• সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে পোশাক কারখানা মালিক সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত না করা	৪৩. বর্তমান দশম জাতীয় সংসদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে কোনো কারখানা মালিককে সদস্য করা হয়নি	সম্পন্ন	বর্তমান কমিটিতে দুজন শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িত সদস্য রয়েছেন, ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৩০.	বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনিয়ম, পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করা	• সরকার, মালিক ও শ্রমিক সমন্বয়ে নিরপেক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি সেল কার্যকর করা	৪৪. শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি নেই	মন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত
৩১.	বিচারের আওতায় আনা	• দোষী কারখানা মালিকদের গ্রেপ্তার থেকে রক্ষার চেষ্টা	৪৫. দোষী কারখানা মালিকদের গ্রেপ্তারে সহযোগিতা	অগ্রগতি হয়েছে	-

১.৪ কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৩২.	• অপর্যাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো (পরিদপ্তর) • অপর্যাপ্ত জনবল- ৩১৪ জন (মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন কারখানা পরিদর্শকের মধ্যে কর্মরত ৫৬ জন) • ঢাকা অঞ্চলে পরিদর্শক ২২ জন	• দক্ষতা, জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	৪৬. পরিদপ্তরের পরিদর্শক পদের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান ৪৭. অধিদপ্তরে রূপান্তর - ১৫ জানুয়ারি '১৪ মোট জনবল ৯২২ জন (মঞ্জুরিকৃত পরিদর্শক ৫৭৫ জন, কর্মরত ১৩৫ জন)	সম্পন্ন	নবম সংসদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত জনবলের (১৯৮৬ জন জনবল বৃদ্ধি করে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করে) চেয়ে কম জনবল (৯২২ জন) নিয়ে অধিদপ্তর গঠন
			৪৮. ২০০ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময়ের (৩১ মার্চ ২০১৪) মধ্যে মাত্র ২৫ জনের নিয়োগ সম্পন্ন
৩৩.	পরিদর্শকদের যোগ্যতা (কর্মরত পরিদর্শকদের মধ্যে ন্যূনতম এসএসসি ডিগ্রিধারী)		৪৯. পরিদর্শকের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চতর করা (স্নাতকোত্তর/বিসিএস ইঞ্জি./এমবিবিএস)	অগ্রগতি হয়েছে	বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে নিয়োগের উদ্যোগ
৩৪.	• প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশে মোট অফিস ৩২টি • কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলে অফিস না থাকা		৫০. প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশে মোট অফিস ৭২টি ৫১. পোশাক-অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৫টি নতুন অফিস স্থাপন	অগ্রগতি হয়েছে	প্রথম ধাপে ২৩টি অফিসের কার্যক্রম শুরু
৩৫.	• কারখানা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার না থাকা • সনাতনি তথ্য ব্যবস্থাপনা	• কারখানার কমপ্লায়েন্স, অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিদর্শনের তথ্য নিয়ে প্রকাশ্য তথ্যভান্ডার গড়া	৫২. অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মুক্তকরণ ৫৩. কারখানা-সংক্রান্ত প্রকাশ্য তথ্য ভান্ডার গঠন	সম্পন্ন	গত সপ্তাহে উন্মুক্ত করা হয়েছে অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত করা হয়নি

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
		• অফিস ব্যবস্থাপনা কম্পিউটারাইজড করা ও পরিদর্শন-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা	৫৪. আইএলও কর্তৃক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ ও অফিস অটোমেশনের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন	অগ্রগতি হয়েছে	একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
			৫৫. কলকারখানা অধিপ্তরের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময় ছিল- ৩০ জুন, ২০১৩
৩৬.	নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব লজিস্টিক স্বল্পতা	• সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং লজিস্টিক বৃদ্ধি করা	৫৬. আইএলও কর্তৃক শ্রমিক অধিকার, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ ৫৭. পরিদর্শকদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা	অগ্রগতি হয়েছে	এসব বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি
৩৭.	পরিদর্শন কার্যের কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকা (পরিদর্শকদের সবাই একই পদে হওয়া)	• জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কর্মকর্তাদের পদোন্নতিপূর্বক প্রেষণা প্রদান	৫৮. কেন্দ্রীয় অফিস হতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ ৫৯. কার্যকর জবাবদিহি কাঠামোর জন্য পরিদর্শক পদে তিনটি স্তর সৃষ্টি (উপ-মহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক ও পরিদর্শক)	অগ্রগতি হয়েছে	প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে
			৬০. অভিযুক্ত সাত পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও সাময়িক বরখাস্ত	অগ্রগতি হয়েছে	অভিযুক্ত পরিদর্শকদের কাজে যোগদান
৩৮.	• অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন • ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম	• অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	৬১. কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে	সম্পন্ন	কার্যক্রমটি প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয়েছে
৩৯.	• অনেক ক্ষেত্রে পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা • মামলায় অভিযোগ প্রমাণে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে ব্যর্থতা	• প্রভাবমুক্ত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আইনজীবী প্যানেল গঠন করা	৬২. বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০ মামলা চলমান ৬৩. নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ আলোচনাধীন	অগ্রগতি হয়েছে	মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ

১.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৪০.	• অপর্যাপ্ত জনবল (ঢাকা বিভাগে ১৫ জন পরিদর্শক) ও সক্ষমতার ঘাটতি • আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব	• দক্ষতা, জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	৬৪. ২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগের অনুমোদন	অগ্রগতি হয়েছে	নির্ধারিত সময় ছিল- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
			৬৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬২ কোটি টাকার প্রকল্প বিবেচনাধীন ৬৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন	অগ্রগতি হয়েছে	দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এখনো শুরু হয়নি
৪১.	• পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নিনির্বাপক স্টেশন না থাকা	• পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও জনবলসহ অগ্নিনির্বাপক স্টেশন স্থাপন	৬৭. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৯টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি হয়েছে	ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা চলমান
৪২.	• ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ ভবনে অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদান • অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা জলাধার না থাকা, টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত নির্গমন দরজা ইত্যাদি অনিয়মের ক্ষেত্রে পরিদর্শনে অর্থের বিনিময়ে ছাড় দেওয়া	• অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	৬৮. তাজরীন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী ১১০০ কারখানা পরিদর্শন (চলমান), ত্রুটিপূর্ণ কারখানায় আর্থিক জরিমানা	অগ্রগতি নেই	ত্রুটিপূর্ণ কারখানার মালিককে পত্র দেওয়া হলে সাড়া পাওয়া যায়নি
			৬৯. অগ্নিনিরাপত্তা সনদ ও নিবন্ধনে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান	সম্পন্ন	দুর্নীতি দূরে দৃশ্যমান প্রায়োগিক অগ্রগতি নেই
			৭০. অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত হট লাইন চালু	সম্পন্ন	
৪৩.	অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পর্যায়ে সক্ষমতা ও সচেতনতার অভাব	• সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা	৭১. অগ্নিনিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রতিরোধে স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়নে মালিক, শ্রমিক ও ইউনিয়ন প্রতিনিধির সক্ষমতা কার্যক্রম ৭২. ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ	অগ্রগতি হয়েছে	কার্যক্রম শুরুর নির্ধারিত সময় ছিল- ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩

১.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৪৪.	কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও তদারকি প্রক্রিয়া	• অনুমোদন প্রক্রিয়ায় হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৭৩. রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ- ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম শুরু ৭৪. ৮টি বিসি কমিটি ও উঁচু ভবনের জন্য ২টি বিশেষ বিসি কমিটি পুনর্গঠন	অগ্রগতি হয়েছে	বিসি কমিটিতে নাগরিক সমাজ, প. আইনজীবী/ পরিকল্পনাবিদদের রাখা হয়নি
৪৫.	জনবল স্বল্পতা- অথরাইজড অফিসার- ৪ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার পদ ছিল না প্র. ইমারত পরিদর্শক- ৮ জন ইমারত পরিদর্শক- ৬০ জন সহ-নগর পরিকল্পনাবিদ পদ ছিল না	• জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	৭৫. নকশা অনুমোদন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কাজে জনবল নিয়োগ- অথরাইজড অফিসার-২০ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার-৩০ জন প্র. ইমারত পরিদর্শক-২২ জন ইমারত পরিদর্শক-১২২ জন সহ-নগর পরিকল্পনাবিদ-১৭ জন	অগ্রগতি হয়েছে	নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৪৬.	লজিস্টিক স্বল্পতা ও সনাতনী অফিস ব্যবস্থাপনা	-	৭৬. অফিস অটোমেশন বিবেচনাধীন ও যানবাহন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	অগ্রগতি হয়েছে	উর্ধ্বতন সিদ্ধান্ত এখনো গৃহীত হয়নি
৪৭.	শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'ব্যবহার সনদ' প্রদানে গাফিলতি	• 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণ নিশ্চিত করা	৭৭. ব্যবহার সনদ গ্রহণের আহ্বানে মাত্র শ'খানেক আবেদন	অগ্রগতি নেই	ব্যবহার সনদ নিশ্চিতকরণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতা
৪৮.	• ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি • নির্মাণ নকশা অনুমোদনে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবির • নির্মাণস্থল পরিদর্শন না করে ভূমি ব্যবহার ও নির্মাণ অনুমোদন ছাড়পত্র প্রদান • হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলে আপত্তি জারি	• অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৭৮. জোনাল অফিস কর্তৃক অনুমোদন ও তদারকির ব্যবস্থা ৭৯. অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ৮০. নকশা যাচাই-বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি হয়েছে	প্রায়োগিক কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৪৯.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা	• অর্পিত দায়িত্ব পালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৮১. রাজউক কর্তৃক মাত্র ৬৫০টি কারখানা পরিদর্শনপূর্বক ১৫০টি কারখানা অধিকতর পরিদর্শনে বুয়েটে প্রেরণ	অগ্রগতি নেই	বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে উল্লেখ্য রাজউকভুক্ত অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক কারখানা রয়েছে
৫০.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতা	• মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় রাজউককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা	৮২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেটের চাহিদা প্রদান	অগ্রগতি হয়েছে	মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন

১.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৫১.	***স্থানীয় সরকার*** • নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব • স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন) ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন না থাকলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন	• রাজউকসহ অন্যান্য নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ ও নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিত করা	৮৩. স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকার ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে প্রদান ৮৪. ইউনিয়ন পরিষদকে ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি	সম্পন্ন	কর্তৃপক্ষের বাইরের অনেক পৌরসভায় প্রকৌশলী নেই
		• জেলা পর্যায়ে জেলা গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা	৮৫. কর্তৃপক্ষের বাইরে ভবন নির্মাণ অনুমোদনের জন্য উপজেলা গণপূর্ত বিভাগকে সংযুক্ত করে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন	সম্পন্ন	কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব না দিয়ে কমিটি গঠনের ফলে জটিলতা ও হয়রানির ঝুঁকি সৃষ্টি
৫২.	***শিল্প পুলিশ*** অর্থের বিনিময়ে পুলিশ/ শিল্প পুলিশ মালিক স্বার্থে ব্যবহার ও শ্রমিক আন্দোলন দমন	• আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	৮৬. দুটি ট্রাক ও একটি মোটরসাইকেল ঢাকা অঞ্চলে সংযোজন	অগ্রগতি নেই	• শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না • শিল্প পুলিশের নীতিমালা প্রণয়ন না করা

১.৮ শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৫৩.	ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আইনি জটিলতা	• প্রতি কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বাধ্যতামূলক করা	৮৭. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন তুলনামূলক বৃদ্ধি (জানু' ২০১৩ হতে ২৫ ফেব্রু' ১৪ পর্যন্ত ১১২টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন)	অগ্রগতি হয়েছে	• ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদন গ্রহণে ১৫-২০ হাজার টাকা গ্রহণ • বড় কারখানায় ইউনিয়ন না হওয়া

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
		• একটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়ায় কত সময় লেগেছে, নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে কি না, না দিলে কেন দেওয়া হলো না তা শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা	৮৮. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, নবায়ন ও ইউনিয়নের বার্ষিক প্রতিবেদন অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ ৮৯. আইএলও এবং ইউএসডিওএল সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে শ্রম পরিদর্শক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান		• পরিদপ্তরের পৃথক ওয়েবসাইট করা হয়নি • রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী ৮৪টি ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের অভিযোগ
			৯০. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অভিযোগের জন্য হটলাইন স্থাপন	অগ্রগতি নেই	নির্ধারিত সময় ছিল - ৩০ জুন, ২০১৩
৫৪.	রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন	• নিবন্ধন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নিবন্ধন
৫৫.	ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব	• প্রশিক্ষণ প্রদান	৯১. সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫০ হাজার শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	অগ্রগতি হয়েছে	এ পর্যন্ত ১২৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান

১.৯ শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৫৬.	তৈরি পোশাক খাতে ১৫৭টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৪০-৫০টি সক্রিয়	• ট্রেড ইউনিয়নকে কার্যকর করা	৯২. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে	অগ্রগতি হয়েছে	রানা প্লাজা-পরবর্তী ‘ল্যাপটপ ট্রেড ইউনিয়ন’-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি
৫৭.	মালিক স্বার্থে বিজিএমইএর পকেট ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম	• ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনকে রাজনৈতিক দল ও বিজিএমইএর সম্পৃক্ততা ত্যাগ করে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করা	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	অপরিবর্তিত
৫৮.	• ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলি সম্পর্কে আইনগত দিক-নির্দেশনা/ বিধিমালার অনুপস্থিতি • ট্রেড ইউনিয়নে জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা; • নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম	• ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলির ‘বিধিমালা’ প্রণয়ন করতে হবে • নেতৃত্ব আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত করা	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	• রানা প্লাজা-পরবর্তী নিবন্ধনহীন ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যক্রমের ব্যাপকতা • শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা • রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া

১.১০ বায়ার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৫৯.	ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট	• একক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা	৯৩. বিজিএমএ কর্তৃক একক আচরণ-বিধিমালা প্রণয়ন	অগ্রগতি হয়েছে	এখনো বাস্তবায়িত হয়নি
৬০.	আমদানিকারক দেশের শর্তাবলি পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স অডিটর ও মালিকদের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার নিরাপত্তার প্রকৃত চিত্র গোপন করা	• কারখানার সঠিক কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেই অনুসারে বায়ারদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে	৯৪. কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা মূল্যায়ন কার্যক্রম ৯৫. জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য বিএনবিসি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সমন্বিত চেকলিস্ট প্রণয়ন ৯৬. নিরাপত্তার প্রশ্নে কারখানা বন্ধের বিষয়ে জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন ৯৭. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় (এনটিপিএ) সব চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- ৯৮. অ্যালায়েন্স (১২/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (৬২৬টির মধ্যে), অ্যাকর্ড (১০/৩/১৪) কর্তৃক ৮০টি (১৬২৬টির মধ্যে) এবং বুয়েট (১৫/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (প্রায় ২০০০টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন	অগ্রগতি হয়েছে	• অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ড কার্যক্রমের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জড়িত না থাকা এবং সমন্বয়হীনতা • অ্যালায়েন্সের ক্ষেত্রে ভলেনটারি সমঝোতার কারণে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির আশঙ্কা • জরিপ কার্যে সময়ক্ষেপণ • বিস্তারিত জরিপ বিষয়ে বুয়েট ও অ্যালায়েন্সের সিদ্ধান্তহীনতা
৬১.	• বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কারখানায় অর্ডার না দিয়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া • বায়ার জ্ঞাতসারে অনেক ক্ষেত্রে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন	• ইউএন গাইডলাইন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সাপ্লাই চেইনে কমপ্লায়েন্স ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা	৯৯. বায়ার কর্তৃক নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদানের প্রবণতা হ্রাস	অগ্রগতি হয়েছে	• বায়ারের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব • কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা না করে এড়িয়ে যাওয়া • অন্য বায়ারকে অর্ডার না দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করা

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশ/ বিশ্লেষণ	বর্তমান অবস্থা	অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
৬২.	শ্রম অধিকার ও কর্মপরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভালো পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ		১০০. অল্পসংখ্যক বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বেশি প্রদান (যেমন প্যান্টের মজুরি ২৪৮ হতে ৩০-৩২৮ ডলার প্রদান) ১০১. বায়ার ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ নিজ উৎপাদন কারখানার কমপ্লায়েন্স মনিটরিং	অগ্রগতি হয়েছে	• অধিকাংশ বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি না করা • প্রতিযোগী দেশে অর্ডার প্রদান
			১০২. রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (৪২ মিলিয়ন ডলার)	অগ্রগতি হয়েছে	• ১৬ মিলিয়ন ডলার সংগৃহীত, ফান্ড গঠনে অনিশ্চয়তা
৬৩.	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল না থাকা	• পিস প্রতি ১-১.৫ সেন্ট প্রদান করে বায়ার-মালিকের সমন্বয়ে (৭৫:২৫ অনুপাতে) খাতভিত্তিক তহবিল গঠন	**কোনো উদ্যোগ নেই**	-	শ্রম আইন অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন হয়নি

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ : এক বছরের (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা*

নাজমুল হুদা মিনা ও মনজুর ই খোদা

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবির পূর্ববর্তী একটি গবেষণায় (অক্টোবর ২০১৩) এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে টিআইবি এ-খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় (টিআইবি ২০১৪)। ওই গবেষণায় (টিআইবি ২০১৪) দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী এক বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ৫৪টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি উদ্যোগ সম্পন্ন এবং সার্বিকভাবে ৯১ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রগতি হয়েছে।[২] এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি এক বছরে (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) এসব উদ্যোগের অগ্রগতির অবস্থা বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য এক বছরে (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- সরকার কর্তৃক গৃহীত (আইনি, নীতি-সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক) পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা;

* ২০১৫ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকায় টিআইবির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ : এক বছরের (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

২ এর মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন, খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিতকরণে টাস্কফোর্স গঠন, পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি (সর্বনিম্ন গ্রেডে মোট মজুরি ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি), ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন না দেওয়ার জন্য পরিপত্র জারি, বায়ার জোট (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তায় জরিপ কার্যপরিচালনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; এবং
- গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন, যেমন– কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মী, কারখানার মালিক, পোশাকশ্রমিক ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

টিআইবি কর্তৃক ২০১৪ সালে প্রকাশিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত ৬৩টি বিষয়ের মধ্যে ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত সাতটি বিষয়ে ২৩টি উদ্যোগ-সম্পর্কিত তথ্য পর্যবেক্ষণের আওতামুক্ত রেখে বাকি ৫৬টি বিষয়-সম্পর্কিত তথ্য বর্তমান গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ৫৬টি বিষয়ের মধ্যে আটটি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো গৃহীত হয়নি; বাকি ৪৮টি বিষয়ে ৮০টি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কোনো ধরনের উদ্যোগ না নেওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় (লিড মিনিস্ট্রি) গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলি-সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও পোশাক খাতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ৪৮টি বিষয়ে গৃহীত ৮০টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১৫ শতাংশ উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৪৫ শতাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন চলমান, ১৫ শতাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন ধীরগতিসম্পন্ন এবং ২৫ শতাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন স্থবির রয়েছে (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন)।

সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

তৈরি পোশাক খাতে এক বছরে (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইপিজেড শ্রমিক আইন, ২০১৪ উদ্যোগ গ্রহণ, শ্রম ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ, শ্রম বিধিমালা চূড়ান্তকরণ ও সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার গাইডলাইন তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ। এ ছাড়া তৈরি পোশাক খাতের জন্য পৃথক বিল্ডিং কোড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া, জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদানে অটোমেশন সার্ভিস চালু করা, কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন করা এবং শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনে 'অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন (এডিআর)' গঠনের অংশ

হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি কারখানায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বায়ার জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স এবং বুয়েট কর্তৃক জরিপকৃত কারখানার সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য দুটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং কলকারখানা ও রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

বর্তমানে প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে এবং অধিকাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) সুইডিশ ব্র্যান্ড 'এইচঅ্যান্ডএম'-এর সহযোগিতায় 'সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' স্থাপন করেছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত ক্র্যাশ কোর্স পরিচালনা করছে। ইউরোপীয় বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) ও মার্কিন বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশ কারখানায় জরিপ সম্পন্ন করেছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে গঠিত 'রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ডে'[৩] প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রস্তাবিত ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত অর্থ থেকে ইতিমধ্যে প্রায় ১২ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাইমার্ক কর্তৃক সরাসরি অনুদানের পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। অন্যদিকে রানা প্লাজার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রায় ১৪টি রিটেইলার ব্র্যান্ড, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– লি কুপার, জেসি পেনি, মাটালান, কারিফোর ইত্যাদি এখনো ট্রাস্ট ফান্ডে কোনো সহায়তা করেনি। অন্যদিকে, সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বেনেটন এবং ওয়ালমার্ট– উভয়ের সহায়তার পরিমাণ ছিল মাত্র এক মিলিয়ন ডলার করে, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম।

অন্যদিকে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ওই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদান থেকে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা)। ওই তহবিল থেকে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২ দশমিক ৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১৯ কোটি টাকা) এবং অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা)। সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য।

---

[৩] বিস্তারিত দেখুন- http://www.ranaplaza-arrangement.org/

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

সরকার ও সরকারি সংস্থা

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, গত বছর শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইপিজেড শ্রমিকদের সংগঠন করার বিধান রেখে 'ইপিজেড শ্রমিক আইন ২০১৪' মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শ্রম আইনের বিধিমালা তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। একইভাবে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ না করা, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা লক্ষণীয়।

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রায়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। একদিকে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও কারখানা নিরাপত্তার অভিযোগ প্রদানে 'হটলাইন' স্থাপন করলেও এ-সম্পর্কিত প্রচারণার অভাব রয়েছে, অন্যদিকে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রম পরিদপ্তর একটি 'হটলাইন' স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেনি। শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মালিকদের সাথে যোগসাজশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আগে শ্রমিকদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া এবং ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে এখনো রাজউক কর্তৃক জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়নি, এমনকি নকশা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা অঞ্চলে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপন ও মুন্সিগঞ্জে পোশাকপল্লি স্থাপনের ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়।

কারখানার মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিজিএমইএর রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনা বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে, এক বছরে কোনো কোনো কারখানায় মজুরি ছাড়াই অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কমপ্লায়েন্স কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া, হেলপার পদে আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা বা চাকরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহির ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার কারণে অনেক কারখানার মালিক নারী শ্রমিকদের জন্য রাত্রিকালীন কাজ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিজিএমইএ কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস গাইডলাইন বিলুপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বিজিএমইএ কর্তৃক কারখানা পর্যায়ে অতিরিক্ত চার কর্মঘণ্টা বৃদ্ধির পরিপত্র জারি ও কারখানার ছাদে ২৫ শতাংশ জায়গায় স্থাপনা রাখার নিয়ম করার প্রজ্ঞাপন চালু করা হয়েছে।

শ্রমিক সংগঠন

এক বছরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিজিএমইএর 'পকেট ট্রেড ইউনিয়ন' বা 'ইয়েলো' ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধির অভিযোগ রয়েছে। সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে এসব ইউনিয়নের যুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবার অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

বায়ার

কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক কারখানায় দ্রুত (দুই-তিন ঘণ্টা) জরিপ সম্পন্ন, বন্ধের আদেশ প্রদান এবং জরিপ কার্যে জড়িত রিভিউ প্যানেল ও বিদেশি জরিপ সংস্থার মাঝে মতৈক্য ও কঠোর কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণের অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে কার্যাদেশ বাতিল, কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অজুহাতে ২২০টি মাঝারি ও ক্ষুদ্র আকারের কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ১ থেকে ১ দশমিক ৫ লাখ শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কারখানা বন্ধের হার ৩৬০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং শ্রমিক চাকরিচ্যুতি হওয়ার হার ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বায়ার, সরকার ও বিজিএমইএ কর্তৃক সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জরিপ করা ও কমপ্লায়েন্স উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলেও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আশঙ্কা করা যায় এ অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতে কর্মরত এক-পঞ্চমাংশ (প্রায় সাত লাখ) শ্রমিকের চাকরিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।

বায়ার জোট পরিচালিত নিরাপত্তা জরিপ কার্যের অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু কারখানার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ধীরগতি লক্ষণীয়, যা বিস্তারিত টেকনিক্যাল জরিপ কাজে যেমন কালক্ষেপণ করবে, তেমনি পোশাক খাতে টেকসই কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদে চলমান কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। জরিপ চলাকালে সংস্কার কাজে কারখানা বন্ধ রাখা হলে শ্রমিকের বেতন ধারাবাহিকভাবে প্রদানে বায়ারের চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার (অ্যাকর্ডের ক্ষেত্রে) রয়েছে, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অ্যাকর্ডের দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স জরিপ-পরবর্তী 'কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান (কেএপি)' প্রকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও এখনো তা প্রকাশ করতে না পারা এবং সংস্কারকার্যে সীমিত সংখ্যক বায়ার অংশগ্রহণ করায় জরিপ কার্যের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আবার চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে প্রথম দুই বছর) কারখানায় অর্ডার প্রদান অব্যাহত রাখার বিধান থাকলেও কোনো কোনো ব্র্যান্ড ও বায়ার কর্তৃক অর্ডার কমিয়ে দেওয়া বা অর্ডার না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

আবার 'অ্যালায়েন্স' স্টিয়ারিং কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পৃক্ত না রাখা এবং 'অ্যাকর্ড' উপদেষ্টা কমিটিতে মালিকপক্ষের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ এ খাতে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার

নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগে সফলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া নতুন কারখানা স্থাপনের পরে অ্যালায়েন্সের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতার নীতি এবং অগ্নিনিরোধক যন্ত্রপাতি আমদানিতে অ্যাকর্ড-নির্দেশিত কোম্পানির বাধ্যবাধকতার নীতি করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শিথিল হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখা যায় না। আগে বায়ার অতি মুনাফার উদ্দেশে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় কার্যাদেশ দিত এবং দুর্ঘটনা হলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো (টিআইবি, ২০১৩)। বর্তমানে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তার অজুহাতে ওই সব নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানাকে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য সহযোগিতা না করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় চূড়ান্তভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিস-প্রতি বাড়তি তিন সেন্ট উৎপাদন খরচ প্রদান করা হলে কারখানা পর্যায়ের কমপ্লায়েন্সের এ বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব।

উপসংহার ও সুপারিশ

২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৫-এর মার্চ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের প্রধান অংশীজন হিসেবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের চাকরিকালীন নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে আইনের সঠিক প্রয়োগের ঘাটতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। অধিকাংশ পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সরকার, মালিকপক্ষ ও বায়ার জোটের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বিজিএমইএর ভূমিকা প্রকট হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক যে সাড়া পাওয়া গেছে, তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক। তবে এই উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে।

সুপারিশ

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

২. অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন সমন্বিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমন্বয় জোরদার করতে ও আন্তবিভাগীয় সমন্বয় সাধনে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে 'পাবলিক সেক্টর বোর্ড' গঠন করতে হবে।

৩. সাব-কন্ট্রাক্ট ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যাপ্রতি ১ থেকে ১ দশমিক ৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফান্ড গঠন করতে হবে।

৫. যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেস গঠন করতে হবে।

৬. সব ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে।

৭. শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকার অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সব বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে।

৯. রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতে সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবিলায় অংশীজনের করনীয়*

নাজমুল হুদা মিনা, নিনা শামসুর রহমান ও শাহজাদা এম আকরাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা, যা তৈরি পোশাক খাতে বারবার সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৪] ২০১৩ সালে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় এ খাতের কাঠামোতে বিদ্যমান অস্বচ্ছতা ও বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা হয়।[৫] গত দুই বছরে এ খাতের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ[৬] গ্রহণ করা হলেও কমপ্লায়েন্সবিহীন কারখানাসহ অনেক কারখানায় এখনো তার প্রতিফলন দেখা যায় না।

তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সমাধানে পশ্চিমা ক্রেতারা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে কারখানার মালিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে ক্রেতাদের কাছে টেকসই 'সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা' এবং এই ব্যবস্থাপনায় স্বীকৃত দায়িত্ব পালন ও কার্যকর কমপ্লায়েন্স উপকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

* ২০১৬ সালের ১০ জানুয়ারি টিআইবির সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণার সারাংশ।

৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.transparency.org/cpi2014/results (২৪ ডিসেম্বর ২০১৪)।

৫ বিভিন্ন অংশীজনের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনার জন্য ২০১৪ সালে একটি এবং পরবর্তী এক বছরে (২০১৪-২০১৫) এসব উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য টিআইবি আরেকটি– মোট দুটি গবেষণা সম্পন্ন করে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/es_rmg_en_07112013.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫); http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/es_ffs_rmg3_15_en.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫); এবং http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/es_ffs_RMG_follow_up_14_en.pdf (১৭ আগস্ট ২০১৫)।

৬ প্রধান পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে ইপিজেড আইন ২০১৩-এর সংশোধন, শ্রম আদালতে শ্রমিকদের সহায়তার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ, শ্রম বিধিমালা চূড়ান্ত করা, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নির্দেশনা তৈরি, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের পরিদর্শনের জন্য দুটি টাস্কফোর্স গঠন, কারখানা পরিদর্শন মহাপরিচালক ও ফায়ার সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ এবং কারখানা পরিদর্শন মহাপরিচালক ও রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ। অন্যান্য অংশীজনের গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানায় ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী মজুরি দেওয়া, কমপ্লায়েন্ট কারখানা থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া, অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিজিএমইএর পক্ষ থেকে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' উদ্যোগ, অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রায় ৬৭ শতাংশ কারখানায় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের জরিপ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4634-governance-challenges-still-exist-in-bangladesh-rmg-sector-tib (১৭ আগস্ট ২০১৫)।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানির সহযোগিতায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের জন্য এই প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, এই সহায়ক প্রশিক্ষণ উপকরণটি মূলত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবসায় দুর্নীতির বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুসারে তৈরি প্রশিক্ষণ সহায়ক উপরকরণের[৭] ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন অবৈধ অনুরোধ ও জোর করে অর্থ আদায় এবং জালিয়াতি ও কাগজপত্র বিকৃতির অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হয়েছে; যার মাধ্যমে প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্নীতির শুরু হয়।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক কোম্পানির মালিক, কর্মী, হিসাব নিরীক্ষক ও এজেন্টরা এ খাতে বিভিন্ন অবৈধ অনুরোধ ও ঘুষ প্রতিরোধে কীভাবে মোকাবিলা করবে, সে সম্পর্কে সহায়ক প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করা।

১.২ গবেষণার পদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশেষ করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রেতা/ প্রতিনিধি/ বায়িং হাউস/ বায়িং এজেন্ট, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক/ কর্মকর্তা, শ্রমিক, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ, মার্চেন্ডাইজার, শিপিং এজেন্ট ও ব্যাংকারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন/ অধ্যাদেশ, আন্তর্জাতিক চুক্তি/ ঘোষণা, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংবাদ/ নিবন্ধন ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সব বায়ার, তৈরি পোশাক কারখানা, নিরীক্ষক বা পরিদর্শক ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উপস্থাপিত তথ্য এ খাতের সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

১.৩ বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের আইনিকাঠামো

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনে বিভিন্ন আইনকানুন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইন ১৮৯৮, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭, দণ্ডবিধি ১৮৬০ এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ২০০২। এসব আইনের আওতায় দুর্নীতি, জোর করে অর্থ আদায়, ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ গ্রহণে সহায়তা, বিদেশি সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণ, অর্থ পাচার এবং নিজ স্বার্থে সরকারি সম্পদ ও রাষ্ট্রের তথ্য ব্যবহার বা তার চেষ্টা ইত্যাদি অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের

[৭] ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই), ইউনাইটেড ন্যাশনাল গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (ইউএনজিসি) এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম পার্টনারিং এগেইনস্ট করাপশন ইনিশিয়েটিভ (পিএসিআই), ***রেজিস্ট : রেজিস্টিং এক্সটরশন*** অ্যান্ড সলিসিটেশন ইন ইন্টারন্যাশনাল ***ট্রানস্যাকশনস*** (২০১১)।

দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। তবে রাষ্ট্রের বাইরে উপরিউক্ত আইনগুলো প্রযোজ্য নয়। অপরদিকে এসব আইন মূলত সরকারি খাতগুলোতে দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়, আর বেসরকারি ব্যবসা পরিচালনায় সংঘটিত দুর্নীতি বাংলাদেশের বর্তমান আইনিকাঠামোর আওতায় পড়ে না।

২ তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনে দুর্নীতি

তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়– কার্যাদেশ পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় ও সরবরাহ পর্যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার বাস্তব ঘটনা নিচে বর্ণনা করা হলো (ফ্লো-চার্ট দ্রষ্টব্য)। তবে আলোচনার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকার ভিত্তিতে নিচে দুর্নীতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছে।

ফ্লো-চার্ট : তৈরি পোশাক সাপ্লাই চেইনে ঘুষ ও অবৈধ অনুরোধের ক্ষেত্র

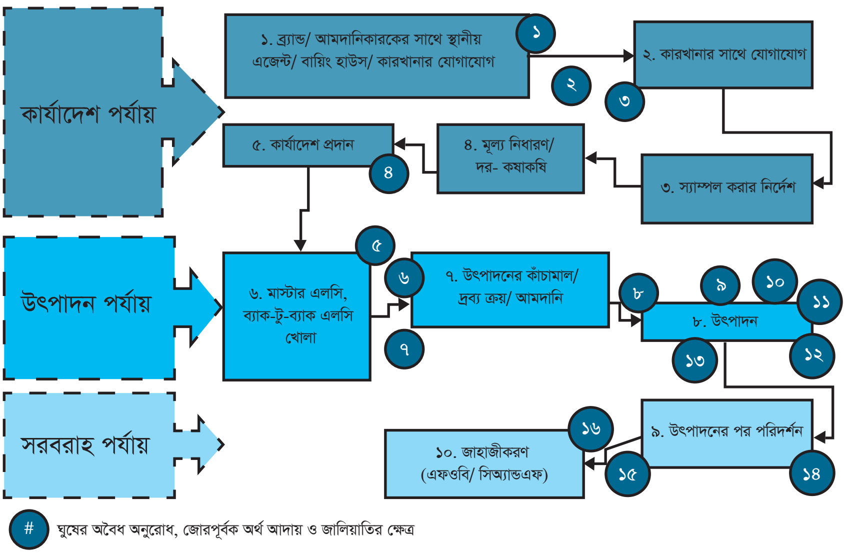

২.১ উৎপাদন ইউনিট কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতি

১. বায়ার নির্ধারিত কমপ্লায়েন্স চাহিদা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার অভিপ্রায়ে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষককে ঘুষ দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরীক্ষক হিসেবে তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ পেলে এবং হঠাৎ কোনো কারখানা পরিদর্শনে গেলে কারখানার মালিক বা কর্মকর্তাদের পক্ষে সবগুলো কমপ্লায়েন্সের দুর্বলতা লুকানো সম্ভব হয় না। তখন কারখানার মালিক কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষককে ঘুষের বিনিময়ে কারখানার কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রভাবিত করেন।

২. ছোট আকারের কারখানার কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য মার্চেন্ডাইজারদের ঘুষ দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ছোট আকারের কারখানা, যাদের সাথে বড় বায়ারদের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই, আবার যথাযথ কাগজপত্রও থাকে না, তারা কার্যাদেশ জোগাড় করতে পারে না। এসব কারখানার কোনো কোনোটির মালিক বা ম্যানেজার মার্চেন্ডাইজারদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং কার্যাদেশে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ কমিশন হিসেবে দেওয়ার চুক্তি করে থাকেন। মার্চেন্ডাইজার এই প্রলোভনে রাজি হয় এবং কিছু উৎপাদন ইউনিটকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

৩. নকল কাগজপত্র তৈরি করা অথবা বিভিন্ন কাগজপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা। একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদন শুরুর আগে বায়ার নিরীক্ষণ অথবা সরকারি কারখানা পরিদর্শকের পরিদর্শনের আগে নকল কাগজপত্র তৈরি করেন অথবা বিভিন্ন কাগজপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করেন। উল্লেখ্য, এসব নকল কাজগপত্র তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যাদেশ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো।

৪. সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়ের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার। খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে বেশি লাভের প্রত্যাশায় তৈরি পোশাক সরবরাহকারী উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য- (ক) ক্রেতাকে অনিবন্ধিত বা নিবন্ধনহীন কারখানায় উৎপাদন করানোর জন্য উৎসাহিত করে এবং (খ) অমনোনীত উৎস হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ে উৎসাহিত করে। উপরন্তু, সে বায়ারের পক্ষে কর্মরত ব্যক্তিকে কমিশন গ্রহণেও প্রভাবিত করে।

৭. তৈরি পোশাক কারখানার ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ভাঙানো। একজন ক্রেতা হতে কার্যাদেশ পাওয়ার পর একটি তৈরি পোশাক কারখানা তার ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত ব্যাংকে একটি ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলে। এটা তখন এই ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করে এবং উপকরণের মানের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন কারখানা থেকে অল্প দামে উপাদান ক্রয় করে। এর ফলে কারখানা আর্থিকভাবে লাভবান হলেও উপকরণের মানের ক্ষেত্রে সমঝোতা করে থাকে। অপরদিকে, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক কখনো কখনো ব্যাংক থেকে সব অর্থ উত্তোলন করেন এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করেন।

৮. একটি কারখানার দ্বারা ন্যূনতম মজুরি, কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তৈরি পোশাক কারখানা দুই-তিনটি হাজিরা খাতা তৈরি করে এবং সঠিক কর্মঘণ্টা গোপন রাখে। উপরন্তু, নকল কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিকদের বয়সসহ মনগড়া শ্রমিক হিসাব উপস্থাপন করে। এ সময় এসব আইন লঙ্ঘন এবং তথ্য বিকৃত করার বিষয় ঘুষের বিনিময়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মান নিয়ন্ত্রকদের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১০. একটি কারখানা বেআইনিভাবে 'সাব-কন্ট্রাক্ট' দেয়। খরচ বাঁচানোর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য অনেক কারখানাই এ কাজ করে। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক

কারখানাগুলো নিজস্ব ব্যবস্থায় উৎপাদন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আর সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের ক্রেতাদের সব কমপ্লায়েন্স চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

১১. এসএসসি নিরীক্ষককে তাদের প্রাপ্ত তথ্য গোপন করার জন্য ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া। যখন এসএসসি নিরীক্ষক বেতন রেজিস্টারে, অগ্নিনিরাপত্তার সনদ, দালান নির্মাণে অনুমোদন এবং কর্মীর বিমাতে কোনো প্রকার অমিল ও অসংলগ্নতা খুঁজে পায়, তখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

১৪. মানের ঘাটতি ও নিম্নমানের পণ্যের বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কারখানার পক্ষ থেকে মান-নিয়ন্ত্রককে ঘুষ দেওয়া। এ ধরনের ঘটনা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বা জোর করে উভয়ভাবেই ঘটে থাকে।

২.২ বায়ার/ সহযোগী/ মার্চেন্ডাইজার কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতি

৫. একজন মার্চেন্ডাইজার তৈরি পোশাক কারখানাকে নির্দিষ্ট কারখানা থেকে উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য করে। এ ধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ডাইজার বায়ারের তালিকাভুক্ত কারখানার পরিবর্তে উৎপাদন ইউনিটকে নিজের পছন্দসই নির্দিষ্ট কারখানা থেকে উপকরণ ক্রয়ে প্রভাবিত করে বা এমনকি বাধ্য করে। এর মাধ্যমে মার্চেন্ডাইজার নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পায়, যদিও এ ক্ষেত্রে উপকরণগুলোর মান খারাপও হতে পারে।

৯. বায়ারদের অনাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা পূরণে জোর করা। উৎপাদন সময়ে অতি দ্রুত পরিবর্তনীয় ফ্যাশনের জন্য বায়ার বিভিন্ন সময়ে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, যা কারখানার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। উপরন্তু বায়ার এসব চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত সময় না দিয়েই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যাদেশ সম্পন্ন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উৎপাদন ইউনিট নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতর পণ্য না দিতে পারলে তা নিজস্ব খরচে আকাশপথে রপ্তানি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, এ ক্ষেত্রে বায়ার নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সমস্ত ক্ষতি উৎপাদন ইউনিটের ওপর চাপিয়ে দেয়।

১২. বায়ার ইচ্ছামতো কার্যাদেশ বাতিল করে। বায়ার তার নিজ দেশের বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার শঙ্কায় বা অনেক ক্ষেত্রে পণ্য স্টক লটে কিনে নেওয়ার অভিপ্রায়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যাদেশ বাতিল করে।

১৩. বায়ার কর্তৃক পরিদর্শন/ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পরিবর্তন করা। সাধারণত এ ঘটনা ঘটে যখন বায়ার পণ্য গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয় না অথবা আগে থেকে অনুমান করে যে পণ্যটি স্থানীয় বাজারে তেমন বিক্রি হবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বায়ার তার নিরীক্ষক/ পরিদর্শন ফার্মের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের প্রতিবেদনে তাদের পক্ষে যায়– এমনভাবে পরিবর্তন করতে প্রভাবিত করে, যাতে দেখানো হয় যে ওই কারখানা সব শর্ত মেনে চলে না, যাতে কার্যাদেশ বাতিল করা বায়ারের জন্য সহজ হয়।

১৫. মান অনুমোদনের জন্য মান পরিদর্শকের নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দাবি। এ ধরনের ঘটনা ঘটে যখন কোনো স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে মান-সম্পর্কিত কোনো ত্রুটি দেখায়, যদিও পণ্যটি কারখানায় উৎপাদনের পর প্রথম পরিদর্শনে মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন কর্মকর্তা পণ্য পাস করানোর জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দাবি করেন।

১৬. বন্দর পরিদর্শনের সময় বায়ারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন। এ ধরনের অবস্থায় বায়ার সব কার্যাদেশ বাতিল এবং সম্পূর্ণ চালান পুনরায় কারখানার গুদামে ফেরত পাঠানোর হুমকি দেয়। এ ক্ষেত্রে বায়ার মূলত পণ্যের ডিসকাউন্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে উৎপাদন ইউনিটকে ব্লাকমেইল করে।

২.৩ উৎপাদন ইউনিট ও বায়ারের যোগসাজশে সংঘটিত দুর্নীতি

৬. প্রয়োজনের তুলনায় উপকরণ আমদানি ও বাড়তি উপকরণ খোলা বাজারে বিক্রি করা। এটি সাধারণত বায়ার ও তৈরি পোশাক কারখানার/ বিক্রেতার যোগসাজশে ঘটে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে মুনাফা ভাগ করে নেওয়া হয়।

৩ উপসংহার

গবেষণা হতে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম-বেশি অনিয়ম সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব দুর্নীতি কখনো জোরপূর্বক আবার কখনো বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক। শ্রম ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের পরিবীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের টাকা-ভরা খাম ধরিয়ে দিলেই নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি ‘এড়িয়ে যাওয়া’ যায়। বায়ারের আচরণবিধির সাথে সামঞ্জস্যহীন পণ্যের মান, পরিমাণ ও কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি ঢাকার জন্য ঘুষ ব্যবহৃত হয়। অংশীজনের সুশাসনের ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ এ ধরনের পরিবেশে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য আরেকটি ‘কৌশল’ হিসেবে চাঁদাবাজি ব্যবহৃত হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য, ভিন্ন ভিন্ন অংশীজন-উৎপাদন ইউনিট/ কারখানা, বায়ার, তৃতীয় পক্ষ এবং অন্যদের মাঝে দুর্নীতির চর্চা ব্যাপক হারে বিদ্যমান।

৪ সুপারিশ

সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

৪.১ বায়ার

১. বায়ার/ ভোক্তাদের দ্বারা যথাযথ নিরীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. নিয়মিতভাবে নীতি ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের ওপর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। প্রতিটি নিরীক্ষার ওপর বায়ার সংগঠনের উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকদের কার্যকর মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বণ্টন কেন্দ্র ও সরবরাহকারী কারখানার ওপর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ঘোষিত ও অঘোষিত নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. বায়ার/ ভোক্তা কর্তৃক অভিযোগ দেওয়ার জন্য সহজে ও বিনা মূল্যে প্রবেশযোগ্য সতর্কীকরণ হটলাইন (অনৈতিক, অসাধু ও অন্যায্য আচরণ) স্থাপন করতে হবে।

৪. সব বায়ারকে অবশ্যই যাদের সাথে ব্যবসা করছে বাংলাদেশে অবস্থিত এমন কারখানার তথ্য তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪.২ বিজিএমইএ

৫. সংশোধিত শ্রম আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সদস্যদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬. সনদপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।

৭. বিজিএমএ ও বায়ারের যৌথ উদ্যোগে বায়ারদের কমপ্লায়েন্স চাহিদা নিরূপণ করতে পারে এমন কারখানার একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৪.৩ সরকার

৮. সরকারকে সব কারখানার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে প্রতিটি কারখানার জন্য আলাদা শনাক্তকারী নম্বর থাকবে; যেন তথ্যের কোনো ধরনের কারসাজি, প্রতিলিপি অথবা সংশোধন করা না যায়।

৯. সব ধরনের জালিয়াতি ও নকল কাগজপত্র তৈরি এবং অসঙ্গতি প্রতিরোধে সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নিয়মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও সক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ তদারকি করতে হবে।

১০. কারখানার ন্যূনতম মজুরি সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে একটি তদারকি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মনীতি প্রয়োগে কঠোর হতে হবে।

১১. সরকারকে বিজিএমইএর সহায়তায় শ্রম অধিকার ও ব্যবসায়িক সততা নিশ্চিত করার জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্র বা কর্তৃপক্ষ স্থাপন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি ও বিশেষ জনগোষ্ঠী

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি : বাংলাদেশের দুটি ইউনিয়নের চিত্র*

ফাতেমা আফরোজ, ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, শাম্মী লায়লা ইসলাম,
দিপু রায় ও শাহজাদা এম আকরাম

১.ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।[৮] দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সবগুলো স্তরের মানুষের ওপর, বিশেষ করে ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক ও নীরব জনগোষ্ঠীর ওপর এই নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি (টিআইবি ২০১২)। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত ভিন্নতা কম হলেও দেখা যায় নারীরা সরকারি সেবা ও অর্থ-সম্পদে অভিগম্যতা, অধিকার নিশ্চিত করা ও অবমাননা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০), যা সুশাসন ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

১.২ নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক

দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি পুরোনো নয়। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু গবেষণায় নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব গবেষণাকে কয়েকটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়।

একটি ধারার গবেষণায় নারী কম না বেশি দুর্নীতিপ্রবণ তা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গবেষণায় দুর্নীতির সাথে নারীর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতির সাথে কম দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে। এসব গবেষণার মতে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও জনসম্পৃক্ত এবং সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব দুর্নীতির মাত্রা হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। নারী পুরুষের চেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত– তারা ঘুষ

---

* ২০১৫ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় টিআইবির সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩’ অনুসারে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১৭৭টি দেশের মধ্যে কোনো দেশই ১০০ স্কোর করতে পারেনি (যেখানে স্কোর ১০০ অর্থ সব ধরনের দুর্নীতি থেকে মুক্ত) এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশই (৬৯ শতাংশ) ৫০-এর নিচে স্কোর পেয়েছে। ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩’ অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ২৭, যার অর্থ বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। ২০১২ সালে এই স্কোর ছিল ২৬ (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (২১ মে ২০১৪)। অন্যদিকে টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

দেওয়ায় কম যুক্ত থাকে ও ঘুষ নেওয়ায় কম আগ্রহী হয় (ডলার ও অন্যান্য ১৯৯৯; সোয়ামি ও অন্যান্য ২০০১; ট্রগলার ও ভালেভ ২০০৬; বোম্যান ও গিলিগান ২০০৮; রিভাস ২০০৮; সামিমি ও হোসেনমারদি ২০১১)।

অন্যদিকে উপরিউক্ত ধারণার সমালোচনা করে অন্যান্য কয়েকটি গবেষণায় বলা হয়, দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক মূলত আরোপিত এবং এ-সম্পর্ক এমন প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে, যেখানে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, যা জেন্ডার সমতা ও সুশাসনকে উৎসাহিত করে। এসব গবেষকের মতে, সরকারে নারীদের বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের ফলে দুর্নীতি হ্রাসের কারণ নারীদের সততা নয়; বরং একটি 'স্বচ্ছতর ব্যবস্থা'র উপস্থিতির কারণে দুর্নীতি হ্রাস পায়। দুর্নীতির ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের প্রভাবের চেয়ে মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব অনেক বেশি; যা নিম্ন পর্যায়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে বেশি জবাবদিহি নিশ্চিত করে। তারা আরও বলেন যে প্রথমোক্ত ধারণা কীভাবে জেন্ডার সম্পর্ক দুর্নীতির সুযোগকে ব্যাহত করে তা ব্যাখ্যা করে না, বিশেষ করে যখন দুর্নীতির সব প্রক্রিয়া পুরুষশাসিত ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নারীরা সামাজিকভাবে এই নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে (সুং ২০০৩; গোটশে ২০০৪; ভিজয়ালক্ষ্মী ২০০৫; আলোলো ২০০৭; আলাতাস ও অন্যান্য ২০০৯; ব্রানিসা ও জাইগলার ২০১০)।

জেন্ডারভেদে দুর্নীতির প্রভাবে কোনো তারতম্য আছে কি না কিংবা নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বেশি কি না, সে বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক দুর্নীতি জরিপে দেখা যায় নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম প্রকাশ করে (নাওয়াজ ২০০৮)। বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৯, ২০০১) ও ইউনিফেমের (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী সরকারের জনসেবা ব্যবস্থার (যেমন– শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) প্রাথমিক সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতির শিকার (টিআইবি ২০১২)।[৯] সেপপানেন ও ভারতানেনের (২০০৮) মতে, নারী ও দরিদ্ররা; বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা স্বাস্থ্য ও সেবা খাতগুলোতে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হওয়ার কারণে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া লিমপানগগ (২০০১) নারীর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রভাবকে যেসব সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যৌন নিপীড়ন বা সেবার বিনিময়ে সুবিধা চাওয়া (যেমন– পদোন্নতি বা চাকরি পাওয়া), পেশাগত বিভাজন ও বেতন পার্থক্য, চাকরি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব, কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া (যেমন– সেক্রেটারি হবে নারীরা এবং ম্যানেজার হবে পুরুষরা)।

[৯] জরিপে দেখা যায় সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার, যেখানে কোনো কোনো খাত যেমন– আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ (২০১২)।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার সময় দুর্নীতির সাথে কিছু বিষয়, যেমন– বৈষম্য, মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা/ নারী নির্যাতন ও অপরাধ ইত্যাদি মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। আরও দেখা যায়, দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় তৃণমূল নারীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুর্নীতির ধারণা আড়ালে থেকে যায় এবং প্রায়ই প্রকাশিত হয় না (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০; মুতোনহুরি ২০১২)। নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন বলে দেখা যায়, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত (ইউএনডিপি ২০১২; মুতোনহুরি ২০১২), এবং একই সাথে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, দুর্নীতি পরিমাপে ব্যবহৃত সূচকসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল নয় (gender-blind), এবং দুর্নীতির জেন্ডার মাত্রা (dimension) পরিমাপে নতুন সূচক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০)। দুর্নীতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে যৌন নিপীড়ন এবং পাচারকে যুক্ত করা হয়েছে, যা দুর্নীতিরই আরেকটি ধরন এবং তুলনামূলকভাবে নারীরা বেশি সম্মুখীন হয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছে (নাওয়াজ ২০১২)।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে জেন্ডার ও দুর্নীতির বিভিন্ন আলোচনায় দুর্নীতিকে নারীর অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে গবেষকদের মতে, দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পর্ক নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশি নারীরা যেসব দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে। একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও দুর্নীতি নিয়ে বিশদ গবেষণা সম্পন্ন হলেও নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি এবং এসব দুর্নীতি মোকাবিলায় নারী কী ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে, তার ওপর গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে। টিআইবির লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। টিআইবি মনে করে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে নারী অধিকার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর তাই এর সব কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সংবেদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। দুর্নীতি মোকাবিলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে, এটা উদঘাটন করা হলে তা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং নারীর দুর্নীতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন– ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতিনির্ধারণে সহায়তা করবে। সর্বোপরি এ ধরনের একটি গবেষণা দুর্নীতির সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা;
২. কী কী আর্থসামাজিক উপাদান নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে করে তা পর্যালোচনা করা;
৩. দুর্নীতি মোকাবিলায় নারী কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা; এবং
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এ গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার' (টিআই ২০০৯)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ববলে যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন, তা ব্যবহার করে তার নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করেন বা এ ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্বার্থ আদায়ে সহায়তা করেন তাকেই দুর্নীতি[১০] হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠান বোঝানো হয়; তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠান বলতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও বোঝানো হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় নারীরা দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কেন তা তাদের বক্তব্য বা মতামত থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির যে ধরনের অভিজ্ঞতা নারীর হয়, সেগুলোও এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। নারীদের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার দুর্নীতি; যেমন– দুর্নীতির শিকার ও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে, সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের মাধ্যমে) ইত্যাদি সব ধরনের অভিজ্ঞতা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় শুধু পল্লি অঞ্চলের (ইউনিয়ন পর্যায়ে) নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব খাতে নারীর অংশগ্রহণের উদাহরণ রয়েছে, সেসব খাত গবেষণার আওতাভুক্ত।[১১] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারীদের জীবনের যেকোনো সময়ের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে এ গবেষণায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১.৫ গবেষণাপদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস ২০১০) তথ্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে গাজীপুর জেলায় একটি এবং অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে জামালপুর জেলার একটি ইউনিয়নকে বেছে নেওয়া হয়। এই দুটি ইউনিয়নে চার মাস অবস্থান করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই দুটি ইউনিয়নের মোট ২৩টি গ্রাম থেকে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বা জ্ঞাত রয়েছেন– এমন ৬৬ জন নারীকে শনাক্ত করে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে সেবাদাতা পর্যায়ে

[১০] এ গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন; যেমন– ঘুষ, চাঁদাবাজি বা জোর করে আদায়, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, দায়িত্বে অবহেলা, দুর্ব্যবহার, হয়রানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

[১১] এসব খাতের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, থানা-পুলিশ, বিচারিক সেবা, ভূমি, এনজিও।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বা অংশীজন হিসেবে মোট ১৩ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে,[১২] এবং বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণিভেদে ২৭ জন নারীর অংশগ্রহণে চারটি দলীয় আলোচনা আয়োজিত হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, সরকারি প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ গবেষণা এলাকার পরিচিতি

২.১.১ অবস্থান ও যোগাযোগের ব্যবস্থা : গাজীপুর জেলার ইউনিয়নটি জেলা সদর থেকে পাঁচ কি.মি. ও জামালপুর জেলার ইউনিয়নটি জেলা সদর থেকে ৩০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। উভয় ক্ষেত্রে যোগাযোগের

সারণি ১ : গবেষণা এলাকার পরিচিতি

	গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়ন	জামালপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়ন
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	পাঁচ কি.মি. দূরে অবস্থিত	৩০ কি.মি. দূরে অবস্থিত
শিক্ষার হার	৫৮ দশমিক ৫ শতাংশ (নারী ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ, পুরুষ ৬০ দশমিক ২ শতাংশ)	৩১ শতাংশ (নারী ২৫ শতাংশ, পুরুষ ৩৭ শতাংশ)
ধর্মীয় পরিচয়	৭৮ দশমিক ৭ শতাংশ মুসলিম, হিন্দু ২১ দশমিক ২ শতাংশ	৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ মুসলিম, হিন্দু শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ
পেশা	প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষিজীবী, ১৫ শতাংশ পশুপালন, ৮ শতাংশ দিনমজুর	প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষিজীবী, ১৩ শতাংশ কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা, ৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা/দোকান
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নারী	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধান শিক্ষক- ১০, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৮, উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা - ১	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধান শিক্ষক - ৮, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী - ২, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৬
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক, এনজিও	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, জীবন বীমা (বেসরকারি), এনজিও
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	ভিজিডি - ২০০, বিধবা ভাতা - ১৫৯, বয়স্ক ভাতা - ৭৫০, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩০, প্রসূতি ভাতা - ৩০	ভিজিডি - ১১২, বিধবা ভাতা - ১৬৫, বয়স্ক ভাতা - ২৫৫, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩, প্রসূতি ভাতা - ২২

তথ্যসূত্র : সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, জানুয়ারি ২০১৫।

[১২] এদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা, ফার্মাসিস্ট, পরিবারকল্যাণ স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবারকল্যাণ সহকারী, ইউনিয়ন ভূমি (তহশিল) কার্যালয়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক এবং স্থানীয় এনজিওর কর্মকর্তা।

প্রধান মাধ্যম অটোরিকশা, টেম্পো, রিকশা ও ইজিবাইক। গাজীপুরে দূরত্ব কম হওয়ায় ইউনিয়নের বাসিন্দারা জেলা সদর বা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা ও সেবা কম সময়ে গ্রহণ করতে পারে। তবে জামালপুরের ইউনিয়নের সাথে সদরের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ট্রেন।

২.১.২ *পেশা ও আয়ের উৎস :* গবেষণার আওতাভুক্ত দুটি ইউনিয়নই কৃষিপ্রধান অঞ্চল; বাসিন্দাদের প্রায় ৬০-৭৫ শতাংশ কৃষিকাজে জড়িত। তবে অধিকাংশ কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি গবাদি পশুপালন ও মুরগির খামারের ব্যবসার সাথেও জড়িত। অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর ইত্যাদি। পুরুষরাই প্রধানত কৃষিকাজের সাথে জড়িত; নারীরা সাধারণত মাঠে কাজ করে না, সামাজিকভাবে এটিকে অসম্মানজনক মনে করা হয়। শুধু দরিদ্র, বিধবা, পুরুষ অভিভাবকহীন বা ভূমিহীন নারীরা জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করে, বর্গা দিয়ে বা নিজে বর্গা নিয়ে ও শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। গাজীপুর জেলার ইউনিয়নের গড় মাসিক আয় তুলনামূলকভাবে বেশি; আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স। দুটি এলাকাতেই পরিচিত আরেকটি ব্যবসা হচ্ছে দাদন। এ ব্যবসায় সাধারণভাবে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও নারীদের একটি অংশও এ ব্যবসায় জড়িত। ইউনিয়ন দুটির অধিকাংশ নারীই গৃহিণী, যাদের বেশির ভাগই গরু বা মুরগি পালনে জড়িত। উল্লেখ্য, দুটি ইউনিয়নেই কৃষি খাতসহ বাজার, দোকান ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কম। জামালপুর জেলার ইউনিয়নে নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জামা-কাপড় সেলাই এবং সুঁই-সুতার কাজের সাথে জড়িত।

২.১.৩ *ধর্মীয় পরিচয় ও শিক্ষা :* দুটি ইউনিয়নেরই বাসিন্দাদের প্রায় ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেশির ভাগই ইউনিয়নের প্রান্তে বসবাস করে। গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়নে শিক্ষার হার ৫৮ দশমিক ৫ শতাংশ (নারী ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ, পুরুষ ৬০ দশমিক ২ শতাংশ), যেখানে জামালপুর জেলায় অবস্থিত ইউনিয়নে এটি ৩১ শতাংশ (নারী ২৫ শতাংশ, পুরুষ ৩৭ শতাংশ)।

২.১.৪ *সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নারীর অংশগ্রহণ :* দুটি ইউনিয়নে প্রধান সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও। তবে জামালপুরের ইউনিয়নে আরও রয়েছে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, কৃষি ব্যাংক ও দুটি জীবন বীমা (বেসরকারি)। বেশির ভাগ এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ছাড়া দুটি ইউনিয়নেই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' চলমান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে আসীন নারীদের সংখ্যা খুব কম এবং বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই কোনো নারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বেশি হলেও গাজীপুর জেলার ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী হিসেবে কোনো নারী নেই। দেখা যায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় সীমিত। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও এনজিও খাতে নারীদের সেবা গ্রহণের হার বেশি।

২.২ সামাজিক রীতিনীতি

দেখা যায় পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতির কারণে নারীদের গৃহের মধ্যে থাকতে হয়, যা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কারণে আরও জোরালো হয়। দুটি এলাকাতেই নারীরা পারিবারিক সম্পত্তি তুলনামূলকভাবে কম পায়। নারীরা জমির মালিক বেশি না হওয়ার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে জমির দাম বেশি এবং 'মেয়েরা বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে যায়, জমি নারীর সাথে দিয়ে দেওয়া যায় না'– এমন মনোভাবের কারণে ওয়ারিশরা, বিশেষ করে ভাইয়েরা টাকা দিয়ে জমি নিজস্ব মালিকানায় রেখে দেয়। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের সাথে একধরনের পারিবারিক সমঝোতা করা হয়। দুটি এলাকাতেই মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের হার বেশি। যৌতুক সামাজিকভাবে খুবই প্রচলিত এবং প্রায় বাধ্যতামূলক। দুটি এলাকাতেই পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত।

২.৩ গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি

গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাদের মতে, প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ক্ষেত্রে 'সেবাদাতা যদি চায় তাহলে তা ঘুষ, নিজে থেকে দিলে তা ঘুষ নয়'। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় (যেমন– বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতন) তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক বিষয়ের মধ্যে বাবা বা স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল না পাওয়া এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বাজারদরের চেয়ে কম দামে ভাইদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়াকে নারীরা দুর্নীতি বলে মনে করে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসাৎ; যেমন– ঋণের টাকা, স্বামীর টাকা আত্মসাৎ করাকেও তারা দুর্নীতি বলে মনে করে। গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নয়, তবে অন্য কোনো মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া বা আদায়ও অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন, যার মাধ্যমে কোনো সেবা বা সুবিধা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গবেষণাধীন দুটি এলাকাতেই নারীরা দুর্নীতিকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য করে, যেমন– কোনো কাজ করার জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য টাকাপয়সার লেনদেনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। তবে নারীরা টাকার চেয়ে পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করাতে চায়।

২.৪ নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে কয়েকটি মাত্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। নারীরা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। এর মধ্যে দুর্নীতির শিকার, সংঘটক ও মাধ্যম হিসেবে নারীর দুর্নীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

২.৪.১ দুর্নীতির শিকার (victim) হিসেবে নারী

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। দেখা যায় পল্লি অঞ্চলে নারীরা যেসব সেবা খাতে সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে, যেমন– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লী

বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এ ছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা; যেমন– স্বাস্থ্য খাতে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সরকার খাতে মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি/ ভিজিএফ, মাটি কাটার কাজ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ) ও বিচারিক সেবা খাতে নারী নির্যাতন মামলা দায়ের, শিক্ষা খাতে উপবৃত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করার সময় দুর্নীতির শিকার হয়। স্থানীয় সরকার খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিষদের পুরুষ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র; যেমন– প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটায় নিয়োগ, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে টার্গেট পূরণের জন্য রোগী কেনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে গাছ পাহারা দেওয়ার কাজ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা নিতে গিয়েও নারীদের দুর্নীতির শিকার হতে দেখা যায়।

২.৪.২ দুর্নীতির সংঘটক (actor) হিসেবে নারী

অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এসব নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারী শিক্ষকদের একটি অংশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসে কাজ করানোর জন্য, নারী অভিযোগকারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার-সালিসের রায় নিজের পক্ষে আনার জন্য, বা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার সময় সুবিধা লাভের জন্য ঘুষ দিয়ে থাকে। কোনো কোনো তথ্যদাতার কাছ থেকে চাকরি পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার কথা জানা যায়; যেমন– পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (এফডাব্লিউভি) পদে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য দুই লাখ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশ দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে ভুল তথ্য দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন করা, এ খাতে নির্ধারিত প্রণোদনা আত্মসাৎ করা, ওষুধ বিক্রি ও অর্থ আত্মসাৎ করা এবং দায়িত্বে অবহেলা (নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিত না হওয়া) ও রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা, শিক্ষা খাতে নারী শিক্ষকদের একাংশের উপবৃত্তি বিতরণে ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা আদায়, কোচিংয়ে পড়তে বাধ্য করা এবং দায়িত্বে অবহেলা (নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুস্থ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (ভিজিডি, ভিজিএফ, মাতৃত্বকালীন ভাতা) অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা আদায়, পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের জালিয়াতিতে সহায়তা দেওয়া এবং ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয় ও কৃষি ব্যাংকের সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করার কথা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকে।

২.৪.৩ *দুর্নীতির মাধ্যম (instrument) হিসেবে নারী*

গবেষণা এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে ফাঁকা চেকে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়, যার বিনিময়ে তাদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। পারিবারিক পর্যায়ে নারীকে ব্যবহার করে এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক ঋণ বা দাদনের টাকা আত্মসাৎ করার উদাহরণ রয়েছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে, উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ে, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ও ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব অর্থ আদায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলাফল।

এ ছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহের সময় অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্মনিবন্ধন সনদ তৈরি করে, যেখানে পরবর্তী সময়ে বিবাহ নিবন্ধনকারীকে (কাজি) দুর্নীতির মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করানোর জন্য রাজি করানো হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচিতদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাও নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক।

২.৪.৪ *দুর্নীতির ধরন (type)*

নারীদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কয়েক ধরনের দুর্নীতি চিহ্নিত করা যায়। এক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি, যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ বা প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। আরেক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি; যেমন– সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয় ধরনের যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয় নারীরা তা হচ্ছে লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি, যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি করে। যেমন– ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে মাটিকাটার কাজ দেওয়ার জন্য পুরুষ চেয়ারম্যান এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য পুরুষ কর্মকর্তা মামলা-সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যৌন সুবিধা দাবি করে।

২.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীর কৌশল

নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েক ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, যেখানে অন্য একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে। নারীদের আরেকটি অংশ পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যায় বা সেবার জন্য যোগাযোগ করে, যাতে ওই পুরুষ সদস্য সংশ্লিষ্ট সেবাদাতার সাথে দর-কষাকষি করতে পারে।

২.৬ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

২.৬.১ *ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রভাব :* দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব নারীর মৃত্যু। গবেষণায় বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসকের অবহেলার কারণে নারী রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে; যেমন– ভুল চিকিৎসার কারণে জরায়ু কেটে ফেলা, অনুপযোগী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়া। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয় (ঘুষ দেওয়া বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণে) এবং তার নির্ধারিত প্রাপ্য (সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে প্রাপ্য) পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়; যেমন– জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দেওয়ায় উপার্জনের মাধ্যম হারানো এবং অথবা ঋণগ্রস্ত হওয়া, যার ফলে নারীর ও তার পরিবারের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। এটি হয় নারী নিজে দুর্নীতি করার কারণে, যার ফলে হয় সে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায় হয়।

২.৬.২ *সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব :* দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। ফলে সমাজে, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

২.৬.৩ *রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব :* দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে।

৩. নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা : কারণ বিশ্লেষণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের ঘাটতিকে পল্লি নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উল্লেখ্য, এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

৩.১ পুরুষতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামো

নারী সম্পর্কে পুরুষদের নেতিবাচক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদের তাদের জেন্ডার ভূমিকা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনো নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটামুটি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে তাকে দুর্নীতির মোকাবিলা করতে হয়। সামাজিক রীতিনীতি; যেমন– পুরুষদের বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও তালাক/ পরিত্যাগের

কারণে নারীর সামাজিক অবস্থান দুর্বল হয়ে থাকে। এ ছাড়া কোনো কোনো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক দুর্নীতিকাঠামো তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যার কারণে নারী দুর্নীতির শিকার হয়।

চিত্র ১ : নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো	■ নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ■ জেন্ডার ভূমিকা ■ লৈঙ্গিক পরিচয় ■ সামাজিক রীতি-নীতি, বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, তালাক/ পরিত্যাগ ■ বৈষম্যমূলক আইন ■ প্রশাসনিক কাঠামো
ক্ষমতায়নের ঘাটতি	■ রাজনৈতিক- প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দলীয় অবস্থান ■ অর্থনৈতিক- অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ■ সামাজিক- অবস্থান, যোগাযোগ, সচেতনতা, ধর্মীয় পরিচয়
অভিগম্যতার ঘাটতি	■ বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ- প্রত্রক্ষ; পরোক্ষ ■ তথ্য/ শিক্ষা- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য (সেবাদাতা হিসেবে, সেবাগ্রহীতা হিসেবে) ■ যোগাযোগ ব্যবস্থা- ভৌত অবকাঠামো, প্রযুক্তি
সুশাসনের ঘাটতি	■ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি ■ অংশগ্রহণের ঘাটতি ■ আইনের শাসনের ঘাটতি

৩.২ ক্ষমতায়নের ঘাটতি

নারীর ক্ষমতায়ন দুর্নীতির অভিজ্ঞতার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন নারীর পদমর্যাদাগত অবস্থান, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং রাজনীতিতে তার দলীয় অবস্থান; অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব এবং সবশেষে তার সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, সচেতনতা ও ধর্মীয় পরিচয় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৩.৩ অভিগম্যতার ঘাটতি

বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেবা গ্রহণ প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে নেওয়া হয়, সেটি নারীকে দুর্নীতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে কি না, তা নির্ধারণে কখনো কখনো ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে নারীর অভিগম্যতা এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

৩.৪ সুশাসনের ঘাটতি

সুশাসনের ঘাটতির কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় বলে নিশ্চিত করা যায়। গবেষণা এলাকায় সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, অংশগ্রহণের ঘাটতি এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৪. গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নিচের উপসংহারে পৌঁছানো যায়।

৪.১ দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ : তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। ভূমি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), বিচারিক সেবা বা স্থানীয় সরকার খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদের নিয়মবহির্ভূতভাবে ও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয় এবং সাধারণ জনগণ একে স্বীকার করে নেয়। পল্লি নারীরাও এ ধারণার ব্যতিক্রম নয়। দুর্নীতির এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারী হিসেবে তারা তাদের প্রাপ্য পায় না।

৪.২ দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা : দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে। তারা আইন ও সমাজ দ্বারা আরোপিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে, যার ফলে তাদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে বঞ্চনা (উত্তরাধিকার ও ভূমির ওপর অধিকার), বৈষম্য (প্রাপ্যতা, সম্পদের ক্ষেত্রে) এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত।

৪.৩ নারী দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ততার বিভিন্নতা : নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মাত্রার; যেমন– সম্পৃক্ততার দিক থেকে, দুর্নীতির ধরনের দিক থেকে এবং খাতের দিক থেকে। সম্পৃক্ততার দিক থেকে নারী দুর্নীতির শিকার, সংঘটক, মাধ্যম ও সুবিধাভোগী হতে পারে, যা নির্ভর করে তার আর্থসামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য নিয়ামকের ওপর।

৪.৪ নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ : দেখা যায়, নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় তার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। নারী হওয়ার কারণে দুর্নীতির শিকার হওয়ার সময় বিশেষ কোনো ছাড় পায় না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়, অথবা বিশেষ ধরনের দুর্নীতির মোকাবিলা করতে হয়। যেমন– যৌন সুবিধার বিনিময়ে সেবা প্রাপ্তি।

৪.৫ গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক : গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতায়ন, অভিগম্যতা ও সুশাসনের ঘাটতি। দেখা যায় ক্ষমতা-কাঠামোর ওপরে অবস্থানকারীদের দ্বারা নারীরা দুর্নীতির শিকার হয় এবং প্রান্তিক (peripheral/ marginalized) নারীদের (দরিদ্র, পুরুষ অভিভাবকহীন, বয়োবৃদ্ধ, অমুসলিম) দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

৪.৬ দুর্নীতি মোকাবিলায় নারীদের নিজস্ব কৌশল : গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই মোকাবিলায় নিজস্ব কৌশল রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেবা পেতে বা নিয়মবহির্ভূত কোনো সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো নারী তার সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে। তবে নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে বা উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

৫. সুপারিশ

৫.১ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে

১. দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের চিত্র, দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণ, দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।

২. নারীর সংবিধান-প্রদত্ত সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্মানজনক স্বীকৃতি ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এ-সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষেত্রসহ সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেন তা সমতাভিত্তিক ও আনুপাতিক হয়।

৫. প্রযোজ্য খাতে বা প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ সেবা'র প্রচলন করতে হবে।

৫.২ বাস্তবায়ন পর্যায়ে

৬. যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যায়, সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা, বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে এবং নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. নারীদের জন্য বিশেষ সেবার কার্যকর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহি জোরদার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ-সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে।

৯. সবগুলো সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের (ডিজিটালাইজেশন) মাধ্যমে দুর্নীতি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হবে।

১০. সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ অভিযোগ করার একটি নারীবান্ধব ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনের শাসনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

টিআইবি ২০১২, সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ (সারসংক্ষেপ), ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০১০, আপডেটিং পভারটি ম্যাপস অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

Alatas, Vivi et al 2009, 'Gender, Culture, and Corruption: Insights from an Experimental Analysis', Southern Economic Journal, Vol. 75, No. 3.

Alhassan-Alolo, Namawu, 2007, 'Gender and corruption: testing the new consensus', Wiley Online library, Volume 27, Issue 3, Pages 189–259.

Bowman, D. M. & Giligan, G. 2008, 'Australian women and corruption: The gender dimension in perceptions of corruption', JOAAG, Vol. 3. No. 1.

Branisa, Boris, and Maria Ziegler, 2010, 'Reexamining the link between gender and corruption: The role of social institutions', Discussion Papers, No. 24, Georg-August-Universität Göttingen, http://www.uni-goettingen.de/crc-peg (7 March 2013)

Dollar, David et al, 1999, 'Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government', World Bank Working Paper Series No. 4.

Department of Economic Theory and Economic History of the University of Granada, http://www.ugr.es/~teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers08_10.pdf (21November 2012)

Goetz, Anne-Marie, 2004, 'Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?' http://www.u4.no/document/showdoc.cfm?id=124 (21 November 2012)

Hossain, N. Celestine Nyamu Musembi and Jessica Hughes, 2010, Corruption, Accountability and Gender :Understanding the Connections, UNDP and UNIFEM.

Limpangog, Cirila P, 2001, 'Struggling through Corruption: A Gendered Perspective', http://www.10iacc.org/download/workshops/cs32a.pdf (21 November 2012)

Mason and King, 2001, 'Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice', World Bank Report No. 21776.

Mutonhori, Nyaradzo, 2012, 'What stops women reporting corruption?' www.blog.transparency.org (21 November 2012)

Nawaz, Farzana, 2009, State of Research on Gender and Corruption, U4 Expert

Answer, U4 Anti-corruption Resource Center, http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption (21 November 2012)

Rivas, M. F. 2008, 'An experiment on corruption and gender', Working Paper No. 08/10,

Seppänen, Maaria and Pekka Virtanen, 2008, Corruption, Poverty and Gender: With case studies of Nicaragua and Tanzania, Ministry For ForeiGn Affairs, Finland.

Sung, Hung-En, 2003, ‘Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited’, Social Forces 82: 705-725.

Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar, 2000, 'Gender and

Corruption', IRIS Centre Working Paper No. 232.

TI, 2009, 'Global Corruption Barometer', Berlin, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009 (21 November 2012)

TI, 2009, The Anti-Corruption Plain Language Guide. Berlin.

TI, 2010, Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts, Wroking Paper # 2, Berlin.

Torgler, Benno, and Valev, Neven T, 2006, 'Public Attitudes toward Corruption and Tax Evasion: Investigating the role of gender over time', Working Paper Series, Berkeley Program in Law and Economics, UC Berkeley. http://escholarship.org/uc/item/3983136n (18 November 2012)

U4 Resource Centre, 'Corruption in the Education Sector: Common forms of corruption', http://www.u4.no/themes/education/educationcommonforms.cfm (21 November 2012)

UNIFEM, 2009, Who Answers to Women? Gender and Accountability, Progress of the World's Women Report 2008 / 2009.

Vijayalakshmi, V, 2005, Rent-Seeking and Gender in Local Governance, Working Paper 164, Institute for Social and Economic Change, Bangalore, India.

জাতীয় যুব-সততা জরিপ ২০১৫*

শাম্মী লায়লা ইসলাম ও মনজুর ই খোদা

প্রেক্ষাপট

যুবরা একটি দেশের জনশক্তির সবচেয়ে কর্মশক্তি সম্পন্ন ও উৎপাদনক্ষম অংশ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব। দেশের অব্যাহত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ ও সৎ যুব সমাজ।[১৩] কেবলমাত্র যথাযথ শিক্ষা এবং সততার চর্চাই কাঙ্ক্ষিত মাত্রার মানবসম্পদ নিশ্চিত করতে পারে। যুবরা বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি অর্জনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উত্তরসূরি। বর্তমানেও সামাজিক অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে যুবরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর এজন্য যুবদের মাঝে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা, দুর্নীতিকে না বলার সাহস ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। দুর্নীতি প্রতিরোধের সামাজিক আন্দোলনে যুবদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় যুবনীতিতেও যুবদের জন্য উপযুক্ত উৎপাদনমুখী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, নেতৃত্বসহ সম্ভাবনাময় সব গুণাবলির বিকাশ সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সততা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সততার অভাব দুর্নীতির বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিপর্যায়ে সততার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রেও এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়।[১৪]

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জরিপে দেখানো হয়েছে যে যুবরাও দুর্নীতির শিকার হচ্ছে এবং দুর্নীতির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।[১৫] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১৩ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ২৭ শতাংশ যুবদের জরিপের পূর্ববর্তী এক বছর সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে।[১৬] ২০০৮ সালে টিআইবি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ইয়ুথ

---

* এই গবেষণা প্রতিবেদনটি ২০১৫ সালের ৩০ জুন ঢাকায় টিআইবির সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

[১৩] টিআইবি ২০০৮, ইয়ুথ ইন্টিগ্রিটি ইনডেক্স, বাংলাদেশ প্রতিবেদন।

[১৪] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

[১৫] টিআই ২০১১, পাইলটিং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালস ইয়ুথ ইন্টিগ্রিটি সার্ভে : ইয়ুথ ইন্টিগ্রিটি ইন ভিয়েতনাম।

[১৬] ইউ ফোর অ্যান্টি করাপশন রিসোর্স সেন্টার অ্যান্ড টিআই ২০১৩, বেস্ট প্র্যাকটিসেস ইন এংগেজিং ইয়ুথ ফাইটিং এগেইনস্ট করাপশন।

ইন্টিগ্রিটি ইনডেক্স বা যুব সততা সূচকের অংশ হিসেবে একটি পাইলট জরিপ পরিচালনা করে। ওই জরিপে অংশগ্রহণকারী চারটি দেশের মধ্যে সততার মাত্রার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরে ছিল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দীর্ঘদিন যাবৎ তরুণ সমাজকে দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এসব কাজের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে টিআইবি টিআই-এর সহায়তায় দুর্নীতি ও সততা সম্পর্কে যুবদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নিরূপণ করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় যুব-সততা জরিপ পরিচালনা করে।

জরিপের উদ্দেশ্য

এ জরিপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সততা ও দুর্নীতি সম্পর্কে বাংলাদেশের যুবদের ধারণা, বিশেষভাবে তাদের মূল্যবোধ, নৈতিক মান বিবেচনায় জীবনের বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ নিরূপণ করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে : সততা ও দুর্নীতি সম্পর্কে যুবদের ধারণা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ করা; বিভিন্ন সেবা খাতে যুবদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা জানা; দুর্নীতি প্রতিরোধে যুবদের জ্ঞান, আগ্রহ ও অঙ্গীকারের মাত্রা যাচাই করা এবং দুর্নীতি ও সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ত্রিশোর্ধ্বদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা।

গবেষণাপদ্ধতি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সততা' হচ্ছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নীতি ও নৈতিকতার মূলনীতি বা মানদণ্ডসংবলিত আচরণ ও কার্যকলাপ যা দুর্নীতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যশনাল কর্তৃক প্রণীত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপে বহুপর্যায়ী স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৩১টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি জেলা থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ৪৬১টি মৌজা নির্বাচন করা হয়েছে এবং এই মৌজাকেই প্রাথমিক নমুনায়ন একক বা পিএসউ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি মৌজায় প্রবেশ প্রান্ত থেকে প্রথম খানাটি দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এরপর প্রতি পাঁচটি খানা পরপর পরবর্তী খানাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি মৌজা থেকে আটজন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে মোট ৩ হাজার ৬৫৬ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট তথ্যদাতাদের ৫৮ শতাংশ পল্লি এলাকার এবং ৪২ শতাংশ পৌর এলাকার অধিবাসী।

এই জরিপে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের ব্যক্তিদের 'যুব' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য যুবদের পাশাপাশি ত্রিশোর্ধ্বদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোট তথ্যদাতাদের ২ হাজার ৪১৯ জন বা ৬৬ দশমিক ২ শতাংশ ছিল যুব এবং বাকি ১ হাজার ২৩৭ জন বা ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ ত্রিশোর্ধ্ব। জরিপটি ২০১৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ৭ মে সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

যুব তথ্যদাতাদের গড় বয়স ছিল ২২ বছর এবং তাদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ ছিল পুরুষ এবং ৩৩ শতাংশ নারী। এ ছাড়া যুব তথ্যদাতাদের ৫ শতাংশ নিরক্ষর বা শুধু নাম স্বাক্ষর করতে পারে, ৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে এবং বাকি ৮৭ শতাংশ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যদিকে যুব তথ্যদাতাদের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ৫ শতাংশ বেকার।

প্রধান গবেষণালব্ধ ফলাফল

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলাদেশের যুবরা সততার ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার নৈতিক ধারণা পোষণ করে। নিচে চিত্র-১-এ দেখা যাচ্ছে যে, ৯০ শতাংশের বেশি যুব উল্লিখিত কাজ বা আচরণগুলোকে ভুল বলে মনে করছে, যা তাদের স্বচ্ছ সততার মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণা বেশ স্বচ্ছ হলেও বাস্তব জীবনে সততাচর্চার ক্ষেত্রে যুবদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। ৮-১৬ শতাংশ যুব এই উল্লিখিত কাজ বা আচরণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে যুবদের কেউ কেউ (৪-১০ শতাংশ) বাস্তবে দৈনন্দিন জীবনের এসব পরিস্থিতিগত দুর্নীতির চর্চাকে আচরণগতভাবে ভুল মনে করলেও আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচারে তারা এসব কাজ গ্রহণযোগ্য মনে করছে। কারণ এই সামাজিক ব্যবস্থায় তারা তাদের নৈতিক মান অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ৯৭ শতাংশ যুব সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে কোনো কাজ করানো বা যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে চাকরি দেওয়াকে ভুল কাজ বা আচরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অন্যদিকে উভয় ক্ষেত্রেই ৬ শতাংশ যুব এই কাজগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলেও মনে করছে।

চিত্র-১ : 'সততা' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও আচরণ

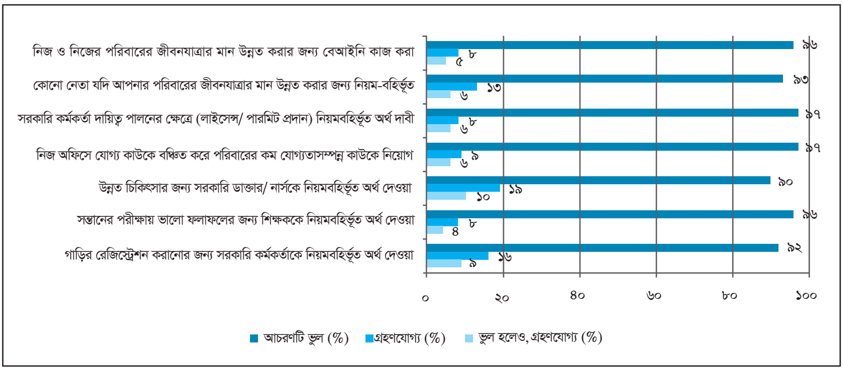

এ জরিপে ৯৮ শতাংশ যুব উত্তরদাতার মতে, একজন 'সৎ মানুষ' কোনো পরিস্থিতিতেই কখনোই মিথ্যা বলে না, প্রতারণা করে না, আইন ভঙ্গ করে না এবং কখনোই দুর্নীতি করে না। তবে নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বাস্তবিক প্রশ্নের উত্তরে যুবরা বলেছে যে একজন 'সৎ মানুষ'ও তার ব্যক্তিগত বা পরিবারের স্বার্থে মিথ্যা বলা, প্রতারণা বা আইন ভঙ্গ করতে পারে।

চিত্র-২ : একজন 'সৎ মানুষ' বলতে যা বোঝায় ...

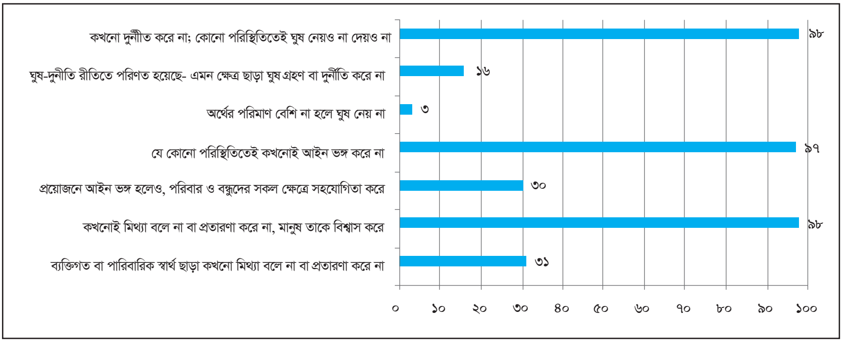

প্রায় ৯৮ শতাংশ যুব 'সততার অভাব'কে দেশের অর্থনীতি ও সার্বিক উন্নয়নের পথে ক্ষতিকর বা একটি বড় ধরনের সমস্যা বলে মনে করে। প্রায় ৯২ শতাংশ যুব মনে করে ধনী হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়া অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্ধেকের বেশি (৫৫ শতাংশ) যুব মনে করে, অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৭ শতাংশ) যুব এই বক্তব্যের সাথে জোরালোভাবে দ্বিমত পোষণ করে এবং ৫ শতাংশ এই বক্তব্যের সাথে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে। এভাবে ৩২ শতাংশ তথ্যদাতা মনে করে যে দুর্নীতির সাথে সাফল্যের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

চিত্র-৩ : অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

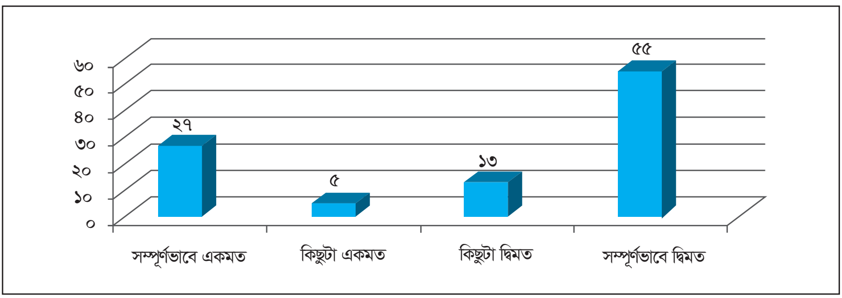

সততা সম্পর্কে জোরালো নৈতিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও কিছু কাল্পনিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যুবদের একটি বড় অংশ স্বীকার করে যে তারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য পরিস্থিতির সাথে সমঝোতা বা দুর্নীতি করবে। যেমন– গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বা কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাওয়ার জন্য (প্রায় ৩২ শতাংশ), কোনো নথি, লাইসেন্স বা পারমিট দ্রুত পাওয়ার জন্য (প্রায় ৩২ শতাংশ) বা কোনো স্বনামধন্য বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা চাকরি পাওয়ার জন্য (প্রায় ৪২ শতাংশ) যুবদের একটি অংশ তাদের নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সমঝোতা করতে বা দুর্নীতির দ্বারস্থ হতে রাজি আছে।

বিশেষ করে একটি স্বপ্নের চাকরি পাওয়ার প্রশ্নে যুবদের এই অংশের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেশি। একইভাবে প্রায় ৫০ শতাংশ তথ্যদাতা বলেছে যে এমন একটি চাকরি পাওয়ার জন্য তারা তাদের নৈতিকতার সাথে সমঝোতা করতে রাজি আছে।

চিত্র-৪ : গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাস করা/ গুরুত্বপূর্ণ কোনো চাকরি পাওয়ার জন্য

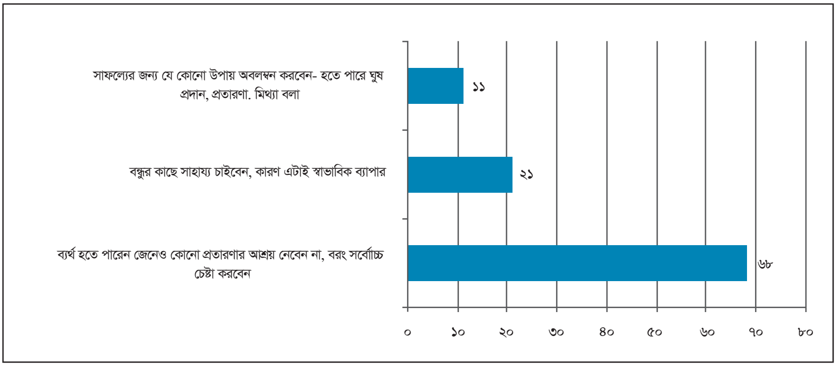

চিত্র-৫ : নিয়োগদাতা চাকরির বিনিময়ে ভবিষ্যৎ বেতনের অংশ দাবি করলে ...

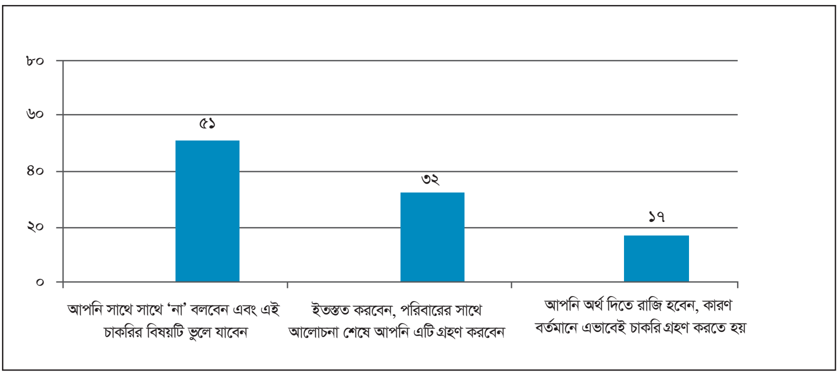

এ জরিপে যুবদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জানিয়েছে যে তারা গত ১২ মাসের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গড়ে প্রায় ২১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ২৯ শতাংশ কোনো কাগজপত্রে স্বাক্ষর, লাইসেন্স, পারমিট বা কোনো ছাড়পত্র পেতে, ২৯ শতাংশ পুলিশি ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে, ২৫ শতাংশ সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা পেতে, ২০ শতাংশ চাকরি পেতে, ১৮ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে এবং ১৭ শতাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে।

চিত্র-৬ : দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

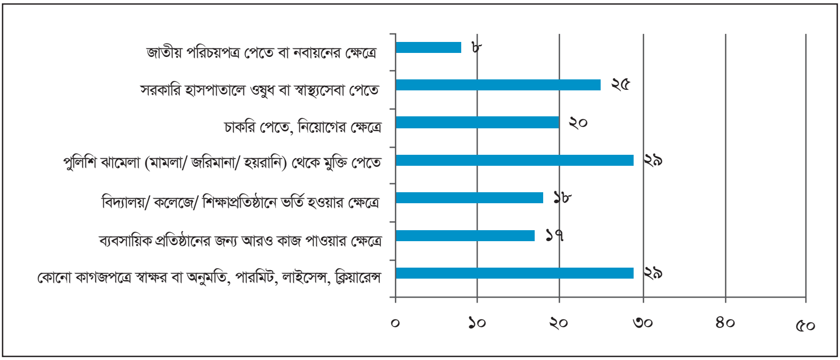

এ জরিপে দেখা যায় যে সরকারি সেবার ওপর যুবদের আস্থা তুলনামূলকভাবে কম। ৮৬ শতাংশ যুবদের রাজনীতিতে বিদ্যমান সততার মাত্রা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। একইভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কে ৬৬ শতাংশ, ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে ৬৫ শতাংশ এবং বিচারিক সেবা সম্পর্কে ৫৭ শতাংশ যুব নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। অপরদিকে ৮৬ শতাংশ যুবদের বেসরকারি ব্যবসা খাত, ৮১ শতাংশের বেসরকারি শিক্ষা, ৮০ শতাংশের সরকারি শিক্ষা ও ৭৭ শতাংশের বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় সততার মাত্রা সম্পর্কে আস্থা রয়েছে।

চিত্র-৭ : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যমান সততা সম্পর্কে তরুণদের ধারণা

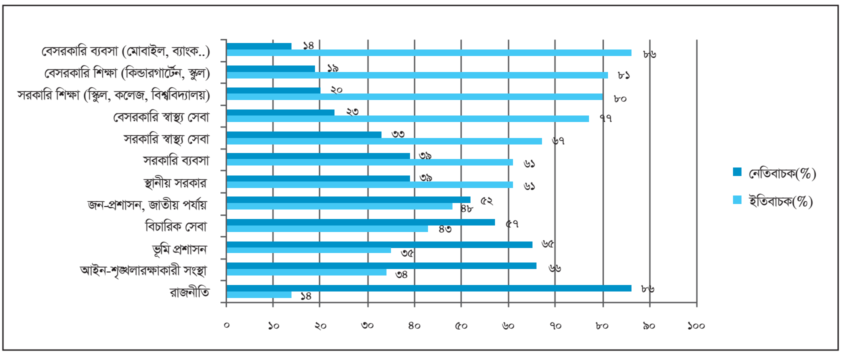

অধিকাংশ যুব (৮২ শতাংশ) মনে করে অ্যাডভোকেসি ও আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সততা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে যুবরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে অধিকাংশ যুব (৮০ শতাংশ) দুর্নীতির সম্মুখীন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবে বলে জানিয়েছে। তবে ৮ শতাংশ জানিয়েছে যে তারা দুর্নীতির সম্মুখীন হলে অভিযোগ করবে না। অভিযোগ না করার কারণ হিসেবে তাদের একটি বড় অংশ (৬২ শতাংশ) মনে করে যে এ ধরনের অভিযোগে কোনো কাজ হবে না এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেই (১০ শতাংশ) বা চায় না (১০ শতাংশ) বা ভয় পাচ্ছে (১৮ শতাংশ)।

চিত্র-৮ : দুর্নীতির অভিযোগ করতে আগ্রহী না হওয়ার কারণ

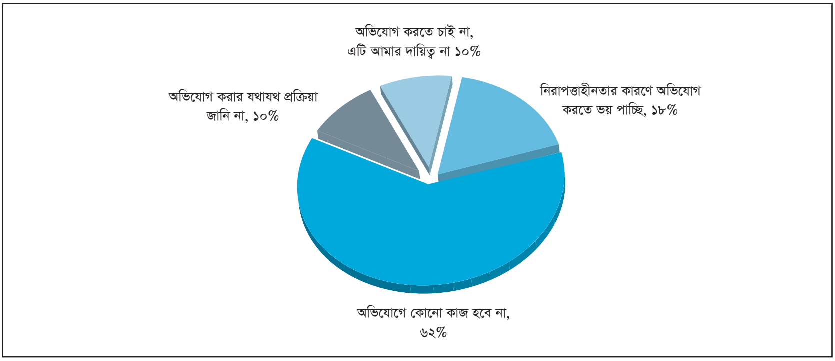

এ ছাড়া বেশির ভাগ যুবরই (৬২ শতাংশ) দুর্নীতি দমনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই, যদিও দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া দেশের দুর্নীতিবিরোধী আইনকানুন, বিধিমালা সম্পর্কে যুবরা (৮৯ শতাংশ) একেবারেই জানে না বা খুবই কম তথ্য জানে বলে জরিপে উঠে এসেছে। অধিকাংশ যুব জানিয়েছে, সততা-সম্পর্কিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

এ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে সার্বিকভাবে দেখা যায় যে সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণা বেশ স্বচ্ছ এবং কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা সততার ধারণা ও চর্চায় দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। যুবদের সততার ধারণা ও চর্চার সাথে ত্রিশোর্ধ্বদের সততার ধারণা ও চর্চার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না এবং একইভাবে তথ্যদাতাদের লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বসবাসের অঞ্চলভেদে গবেষণার ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুপারিশ

১. যুবদের মধ্যে সততার প্রসার ও চর্চার বিষয়টিকে জাতীয় যুব নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে যুবদের ভূমিকা ও কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ কৌশলপত্রে পরিবারের জন্য নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. যুবদের জন্য দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. পাঠ্যক্রমে বিদ্যমান সততা ও দুর্নীতি দমনবিষয়ক শিক্ষা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. দুর্নীতি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা বাস্তবিক অর্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে তরুণদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

৬. যুবদের মাঝে সততা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি ও প্রচারাভিযান গ্রহণ করতে হবে।

লেখক পরিচিতি

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত ও ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সংসদ এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

মো. রবিউল ইসলাম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। রবিউল ইসলাম স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, ভূমি অধিগ্রহণ, নিরাপদ খাদ্য-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি সাউথ-সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নেপালে ফ্রেডসকর্পসেট ফেলো হিসেবে কর্মরত।

নীহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নীহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

মোহাম্মদ নূরে আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ও ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

ফাতেমা আফরোজ

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততা ব্যবস্থা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজবিজ্ঞান' বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

দিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ও এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মো. ওয়াহিদ আলম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং লি কান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে মাস্টারস ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে ভূমি খাতের ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় পর্যায়ের সেবা খাত উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

নীনা শামসুন নাহার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নীনা শামসুন নাহারের গবেষণার বিষয় হচ্ছে শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং তৈরি পোশাক খাত। তিনি সাউথ-সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নেপালে ফ্রেডসকর্পসেট ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রুমানা শারমিন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষা খাত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকমিশন নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়নাধীন এটুআই প্রকল্পে কর্মরত।

ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন।

ড. সাদিদ আহমেদ নূরে মাওলা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি মেরি স্টোপসে কর্মরত।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক পাঁচটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

978-984-34-0190-8